মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৪

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

মে ২০১৮ ইং, শা'বান-রমাজান ১৪৩৯ হি., বৈশাখ ১৪২৫ বাং

شعبان ورمضان ١٤٣٩هـ، مايو ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল

মুফতী আব্দুস সালাম

মাওলানা হারুন

মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪১....... ৫

দরসে ফিক্বহ :

রোযা ও লাইলাতুল কদরঃ ফাজায়েল ও মাসায়েল ৭

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১২

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত....................... ১৩

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের করণীয়.................................. ১৫

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কোরআনের বাংলায়নে জটিলতা :

সমাধান ও বিধি-বিধান.................................. ১৯

মাওলানা কাসেম শরীফ

প্রচলিত খতমে বোখারী অনুষ্ঠান :

দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম হাটহাজারী-এর ফাতওয়া.. ৩৩

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল.......................... ৩৪

মুফতী নূর মুহাম্মদ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪০

গোনাহ মাফের কিছু আমল............................. ৪৩

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮

ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com

www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাতাওয়াগ্রন্থ
‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে তিনি ‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’-এর প্রকাশনার কাজ পরিসমাপ্ত করেছেন। বৃহদাকায় কলেবরে সর্বমোট ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এই ফাতাওয়াগ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাতাওয়াগ্রন্থ। ফকীহুল মিল্লাতি ওয়াদ্ দ্বীন মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ‘মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ’ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ‘মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ’ ‘কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ’ নামেও পরিচিত। ইসলামী ফিকহ ও আইনের ওপর গবেষণা করার মহান উদ্দেশ্যে ৫ মে, ১৯৯১ সালে ‘মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ’-এর পথচলা শুরু হয়। আলহামদুলিল্লাহ, অতি অল্প সময়ে তা সারা দেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আলেম শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর ইসলামী ফিকহ বিভাগ। পাশাপাশি সর্বসাধারণের জিজ্ঞাসা-জবাবের জন্য ‘দারুল ইফতা’ বিভাগ চালু রয়েছে। এখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত ও মৌখিক সমাধান দেওয়া হয়ে থাকে। যেকোনো প্রশ্নে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সমাধান বের করে তা বিজ্ঞ ১০ জন মুফতীর সামনে যাচাই-বাছাই করার জন্য উপস্থাপন করা হয়। সবার নিরীক্ষণের পর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে স্বাক্ষরসহ তা প্রকাশিত হয়। ‘মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ’-এর দীর্ঘ ২৮ বছরের পথপরিক্রমায় রেজিস্টারভুক্ত এ ধরনের ফাতাওয়ার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’ সেসব ফাতাওয়ার গ্রন্থিতরূপ।

ফতোয়া বা ফাতাওয়া শাশ্বত ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম ও ফাতাওয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রখ্যাত অভিধানবিদ ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) লিখেছেন,

الجواب عمايشكل من الأحكام,

অর্থ : ‘(সর্বসাধারণের জন্য ইসলামী শরীয়তের) যেসব বিধান (বোঝা) কঠিন, (শরীয়তজ্ঞের পক্ষ থেকে) তার জবাব বা সমাধান দেওয়ার নাম ফাতাওয়া।’ (রাগেব ইসফাহানী, আলমুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআন, আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

বিজ্ঞ আলেমদের পক্ষ থেকে ফাতাওয়া দেওয়ার এই প্রক্রিয়াকে আরবীতে ‘ইফতা’ বলা হয়। এর স্বরূপ সম্পর্কে ‘মাওয়াহিবুল জালীল’ নামক গ্রন্থে’ এসেছে,

إخباربحكم شرعى من غيرإلزام

অর্থ : ‘ফাতাওয়া দেওয়ার অর্থ হলো, কারো ওপর (জোরপূর্বক) আরোপ করা ছাড়া ইসলামী শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা।’ (আবু আব্দুল্লাহ আল হিত্বাব, মাওয়াহিবুল জালীল, দারুর রিদ্বওয়ান, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৬/৮৬)

ফাতাওয়া দেওয়ার বিষয়টি ইসলামে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য এই বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

অর্থ : “(হে নবী) মানুষ আপনার কাছে ‘কালালাহ’ (উত্তরাধিকার আইনের বিশেষ শাখা) সম্পর্কে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদের ‘কালালাহ’ সম্পর্কে ফাতাওয়া (বিধান) দান করেছেন...।” (সূরা নিসা, আয়াত : ১৭৬)

ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সর্বপ্রথম ফাতাওয়াদানকারী হলেন স্বয়ং রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর ভাষায়,

أول من قام بهذاالمنصب الشريف هوسيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم

অর্থ : ‘ফাতাওয়া দেওয়ার দায়িত্বে সর্বপ্রথম যিনি সমাসীন হয়েছেন, তিনি রাসূলদের সর্দার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।’ (ইলামুল মুয়াককিয়ীন খ : ১, পৃষ্ঠা : ১১)

মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) আরো লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ১৩০ জনের চেয়ে বেশিসংখ্যক সাহাবী ফাতাওয়া দিতেন। আর সাধারণ সাহাবী ও সাধারণ তাবেয়ীরা সেসব ফকীহ বা মুফতীদের কাছ থেকে মাসআলা জেনে আমল করতেন। (ইবনে হাযম, ইহকামুল আহকাম খ : ৫, পৃষ্ঠা : ৮৮; ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মুয়াককিয়ীন, খ : ১, পৃষ্ঠা : ৭-১৮)

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈদের যুগে এ কাজের পরিধি বেড়ে যায়। মক্কায় আতা ইবনে আবী রাবাহ, ত্বাউস ইবনে কাইসান ও ইকরামা (রহ.)। ইয়ামানে মুহাম্মদ ইবনে সাওর ও আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাদ (রহ.)। মিসরে ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব, আমর ইবনে হারেস (রহ.) প্রমুখ এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মুলকে শামে মাকহুল, আবু ইদরীস খাওলানী, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কুফা ও ইরাকে আলক্বামা, ইবরাহীম নাখায়ী, মাসরুক (রহ.) প্রমুখ এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। অতঃপর ইবরাহীম নাখায়ীর শিষ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। মদীনায় প্রসিদ্ধ সাত মুফতী ও তাঁদের শিষ্যরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া খোরাসানে যাহহাক ইবনে মুযহিম (রহ.), বসরায় হাসান বসরী (রহ.), বাগদাদে কাসেম ইবনে সাল্লাম (রহ.) এ দায়িত্ব পালন করেছেন। (আবু আবদুল্লাহ, মারিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃষ্ঠা : ১৯৮-১৯৯)

তাবেঈনের পর এই দায়িত্ব তাবেতাবেঈন মুফতীদের ওপর অর্পিত হয়। তাবেঈদের যুগের শেষের দিকে ও তাবে-তাবেঈদের যুগের সূচনালগ্নে ইসলামী ফিকহের মহাবিপ্লব সাধিত হয়। সেটি ছিল আব্বাসী যুগের সূচনাকাল। সে যুগে ফিকহ ও ফাতাওয়া প্রদান একটি শাস্ত্রে রূপ নেয়। ফিকহের বিভিন্ন পরিভাষা যেমন–ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মাকরূহ ইত্যাদির প্রচলন হয়। ইসলামের ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)। তিনি তাঁর হাজারো ছাত্র থেকে বাছাই করে ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করেন। বিশেষ মাসআলার ক্ষেত্রে দীর্ঘ পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফাতাওয়া আকারে লিপিবদ্ধ করা হতো। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে ঠিক কতগুলো মাসআলা রচিত হয়েছে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। তবে মুয়াফফাক আলমক্কী (রহ.)-এর মতে, সেসব মাসআলার সংখ্যা কিছুতেই ৮৩ হাজারের চেয়ে কম নয়। (মুয়াফফাক ইবনে আহমাদ আলমাক্কী, মানাকিবু আবী হানীফা : ২/১৩৬)। তার পর থেকে যুগে যুগে, দেশে দেশে ফিকহ ও ফাতাওয়ার এই ধারা চলমান। কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের মুফতীরা এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে দেশে দেশে বিভিন্ন ফাতাওয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মিসরে 'মাজমাউল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জর্দানে 'লাজনাতুন লিল ইফতা' গঠিত হয়। ১৯৬১ সালে সৌদি আরবে 'হাইআতু কিবারিল উলামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মালয়েশিয়ায় 'লাজনাল ফাতাওয়া' গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে রাবেতা আল-আলম আল ইসলামীর অধীনে মক্কাস্থ 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে নয়াদিল্লিস্থ 'ইসলামী ফিকহ একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ফাতাওয়া দেওয়া হয়। পরে সেগুলো গ্রন্থিত আকারেও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে কুয়েত সরকারের উদ্যোগে 'আল-মাউসূআতুল ফিকৃহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা' নামে সর্ববৃহৎ কলেবরে ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু ভাষায় দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ', জামিয়া উলূমুল ইসলামিয়া আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী টাউন থেকে 'ফাতাওয়া বাইয়্যিনাত' ও দারুল উলূম হক্কানিয়া থেকে 'ফাতাওয়া হক্কানিয়া' প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'মাজমূআতুল ফাতাওয়া', আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী, 'ফাতাওয়া রশীদিয়া', কুতুবে আলম রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), 'ইমদাদুল ফাতাওয়া', হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), 'ফাতাওয়া মাহমুদিয়া', মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী, 'আহসানুল ফাতাওয়া', মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী, 'ফাতাওয়া উসমানী', মুফতী তক্বী উসমানী ইত্যাদিসহ বহু ফাতাওয়াগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু কিছু ফতওয়াগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তবে সেগুলোর পরিধি সীমিত। অন্য দিকে 'ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত' বিস্তৃত পরিসরে পাঠকের সামনে এসেছে। পাশাপাশি প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে কোরআন, সুন্নাহ, ইমামদের অভিমত ও অন্য ফাতাওয়াগ্রন্থের উদ্ধৃতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসেবে বলা যায়, বিষয়বৈচিত্র্য গুণে গুণান্বিত ও বিস্তারিত অনুচ্ছেদে বিভক্ত মোট ১২ খণ্ডে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাতাওয়াগ্রন্থ হলো 'ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত'। হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর দিকে নিসবত করে এর নামকরণ করা হয়েছে। কেননা সরাসরি তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এ ফাতাওয়াগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হযরতের মেজাজ ও অস্থিমজ্জার সঙ্গে ফিকহ ও ফাতাওয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ইফতা তথা ফাতাওয়া বিভাগ চালু করেছেন। ঢাকায় তিনিই সর্বপ্রথম ফাতাওয়া গবেষণা বিভাগ চালু করেছেন। কাজেই বাংলাদেশে গ্রন্থিত আকারে সবিস্তারে ফাতাওয়াগ্রন্থ প্রকাশের গুরুদায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়। আলহামদুলিল্লাহ, সে দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ২০০৯ সালে ফাতাওয়া সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সালে সে উদ্যোগ অনুযায়ী হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এর উপস্থিতিতে কাজ শুরু করা হলেও তাঁর জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানিতে এ কাজ সমাপ্ত হয়। কিন্তু তত দিনে হযরত রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি হযরতের রূহানী ফয়েয সর্বস্তরে আরো ব্যাপক করে দিন। আর যাঁরা এই ফাতাওয়া সংকলন প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, সবার খেদমত কবুল করে নিন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৮/০৪/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا(٣)

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২. আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহী রূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (আহযাব)

সূরা আহযাবের শুরুর এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। ১. রাসূল (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় তাশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশপাশে কুরায়জা, নযীর বনু কায়নুকাহ প্রভৃতি কতিপয় ইহুদি গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদির মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজি (সা.)-এর খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদের মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজি (সা.) এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদের স্বাগত জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনি ওদের দ্বারা কোনো অশালীন ও অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হওয়ার পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমনি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী)

ইবনে জরীর (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াহ মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদম+তে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করব। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদিগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবি ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলব। এমতাবস্থায় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী)

এরূপ আরো কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রেওয়াত যদিও বিভিন্ন প্রকারের; কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্যতা নেই। এসব ঘটনা উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এই আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দুটি নির্দেশ রয়েছে। ১. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করো। ২. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ কাফের এবং মুনাফিকদের অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা সম্পূর্ণ হারাম ও কাফেরদের অনুসরণ না করার নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনা সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম নির্দেশে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তি করা মহাপাপ গোনাহে কবীরা এবং ওপরে শানেনুযুল প্রসঙ্গে কাফের-মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ। আর নবীজি এর থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং এই নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর ওপর স্থির থাকা। যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের ওপর অটল ছিলেন এবং اتق এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদের হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اتق الله এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপর পক্ষে যেহেতু কোনো মুসলমান মুশরিক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এই আয়াতে যদিও নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত। রাসূল (সা.) ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণের কোনো আশংকাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে। যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে। কেননা যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোনো মানুষই এর আওতাবহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, এ আয়াতে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না করেন, তাদেরকে অত্যধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা এদের সাথে অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজির পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজিকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এ ক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ স্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে। এরূপ কোনো সুযোগও যাতে না হয় এরই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪১

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় :

জামা'আতের বর্ণনা

হাদীস নং-৪।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ :حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ :بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সাথে এভাবে নামায আদায় করে যে, তার তাকবীরে উলা ছোটে না, তবে সে দুটি পরোয়ানা লাভ করবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির, দ্বিতীয়টি মুনাফেকী হতে মুক্ত হওয়া।

(তিরমিযী শরীফ ২/৭ হা. ২৪১, আততারগীব ওয়াত তারহীব হা. ৫৮১)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَنْ صَلَّى فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لاَ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৩৭ হা. ৭৯৮, আল কামেল [ইবনে আদী] ২/৪০৩)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. যেমন হাদীস শরীফে মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, চল্লিশ দিন যাবত বীর্যরূপে অবস্থান করে, পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতের টুকরার আকার ধারণ করে, এই রূপে প্রতি চল্লিশ দিনে এর পরিবর্তন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ " :إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ :اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ

(বোখারী শরীফ ৪/৪১৫ হা. ৩২০৮, মুসলিম শরীফ ৪/২০৩৬ হা. ২৬৪৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৪/৪৭ হা. ৬১৭৪, আবু দাউদ শরীফ ৫/৮২ হা. ৪৭০৮, তিরমিযী শরীফ ৪/৩৮৮ হা. ২১৩৭, ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৫৭ হা. ৭৬।

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৫।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

নবীয়ে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন করে এবং সেখানে

গিয়ে দেখে যে, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, তবুও সে জামা'আতে নামাযের সওয়াব পাবে এবং এই সওয়াবের কারণে যারা জামা'আতের সহিত নামায আদায় করেছে, তাদের সওয়াবের মধ্যে কোনো প্রকার কম করা হবে না।
(আবু দাউদ শরীফ ১/৪১৯ হা. ৫৬৫, নাসাঈ শরীফ ২/১১১ হা. ৮৫৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২০৮ হা. ২০৯, মুসনাদে আহমদ ২/৩৮০ হা. ৮৯৬৯, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯ হা. ৫৮৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ :حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ :إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ

(আবু দাউদ শরীফ ১/৩৮ হা. ৫৬৩, আস সুনানুল কুবরা [বাইহাকী] ৩/৯৮ হা. ৫০১, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯ হা. ৫৮৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৬।

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعِينَ تَتْرَى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ، أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِينَ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ، أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى

নবীয়ে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তির জামা'আতের নামায যাদের একজন ইমাম ও অন্যজন মুক্তাদী হয় চারজন ব্যক্তি পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে চারজনের জামা'আতের নামায আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আটজনের জামা'আতের নামায এক শত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা উত্তম।
(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ১৯/৩৬ হা.৭৩-৭৪, কাশফুল আসতার [বাযযার] ১/২২৭ হা. ৪৬১, সুনানে বাইহাকী ৩/৮৬ হা. ৪৯৬৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৩৮ হা. ২১৪২, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯ হা. ৫৮৫)
হাদীসটির মান : সহীহ

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ :صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ قَالُوا :لَا فَقَالَ :أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ قَالُوا :لَا، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

(সহীহে ইবনে খুজাইমা ২/৩৬৭ হা. ১৪৭৭, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৪০৫ হা. ২০৫৬, নাসাঈ শরীফ ২/১০৪ হা. ৮৪২, আবু দাউদ শরীফ ১/৪১৪ হা. ৫৫৫, মুসনাদে আহমদ ৫/১৪০ হা. ২১৩২৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৪৭)
হাদীসটির মান : সহীহ

ক. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এভাবে যত বড় জামা'আতে নামায পড়া হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তা ছোট জামা'আত অপেক্ষা তত বেশি পছন্দনীয় হবে।
খ. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস দেখে খুশি হন। ১. জামা'আতের কাতার। ২. যে ব্যক্তি মধ্যরাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো সৈন্যদলের সাথে জিহাদ করে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ :الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلصَّلَاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلْقِتَالِ

(ইবনে মাজাহ শরীফ ১/১৩২ হা. ২০০, মুসনাদে আহমদ ৩/৮০ হা. ১১৭৬৭, মুসনাদে আবী ইয়ালা ১/৪৬৮ হা. ১০০০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/২৮৯ হা. ১৯৬৬৩)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

রোযা ও লাইলাতুল কদর

ফাজায়েল ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

রোযার ফজীলত :

রোযা শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোযার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগি থেকে রোযাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

قَالَ اللّٰهُ تعالى : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

যেমন–তিনি এক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।" (বোখারী শরীফ হা. ১৯০৪, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৭৬০)

এ হাদীস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি, নেক আমলের মাঝে রোযা রাখার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি।

তাই সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) যখন বলেছিলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোনো নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি রোযা রাখো। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই।' (নাসাঈ শরীফ-২৫৩৪)

রোযার এত মর্যাদার কারণ কী তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো জানেন। তবে আমরা যা দেখি তা হলো, রোযা এমন একটি আমল, যাতে লোকদেখানো ভাব থাকে না, এটি বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়। নামায, হজ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি কে করল, তা দেখা যায়। পরিত্যাগ করলেও বোঝা যায়। কিন্তু রোযার ক্ষেত্রে লোকদেখানো বা শোনানোর সুযোগ থাকে না। ফলে রোযার মধ্যে এখলাস, আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা নির্ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي-

'রোযাদার আমার জন্যই পানাহার ও সহবাস পরিহার করে।' (মুসলিম শরীফ-২৭৬৩)

☆ রোযাদার বিনা হিসেবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি ও সৎকর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেওয়া হয় না। বরং প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،

'মানবসন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।' (মুসলিম শরীফ-১৫৫১)

☆ রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল :

যেমন হাদীসে এসেছে,

'রোযা হলো ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।' (মুসনাদে আহমদ-৯২১৪)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এক দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে এক খরিফ (৭০ বছরের) দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।' (মুসলিম শরীফ-২৭৬৯)

☆ রোযা হলো জান্নাত লাভের পথ :

হাদীসে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন, যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন,

'তুমি রোযা রাখো। কেননা, এর সমকক্ষ আর কোনো ইবাদত নেই।'

(নাসাঈ শরীফ-২২২০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ :أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟

فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

'জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোযাদারগণই শুধু সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যখন তাদের প্রবেশ শেষ হবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' (বোখারী শরীফ-১৮৯৬)

☆ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম :

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

'যার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।' (বোখারী শরীফ-১৭৯০)

☆ রোযাদারের আনন্দ :

যেমন হাদীসে এসেছে,

'রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ : একটি হলো ইফতারের সময়, অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।' (মুসলিম শরীফ-১১৫১)

☆ রোযা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে :

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'রোযা ও কোরআন কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, রোযা বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনেরবেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।' (মুসনাদে আহমদ-৬৬২৬)

☆ রোযা গোনাহ মাফের উপায় ও গোনাহের কাফফারা :

হাদীসে এসেছে,

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ،

'মানুষ যখন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন-সম্পদের কারণে গোনাহ করে ফেলে, তখন নামায, রোযা, সদকা সে গোনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।' (বোখারী শরীফ-৫২৫)

আর রমাজান তো গোনাহ মাফ ও মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে রমাজান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা রাখবে, তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বোখারী শরীফ-৬৮৩)

ইহতিসাবের অর্থ হলো : আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে–এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্টচিত্তে কোনো ইবাদত করা।

রোযার হিকমত, লক্ষ্য ও উপকারিতা :

(১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন।

(২) শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করা।

(৩) রোযা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

(৪) ঈমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার সুন্দর পন্থা।

(৫) ধৈর্য, সবর ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টির মাধ্যম।

(৬) নিজেকে আখেরাতমুখী করার অনুশীলন।

(৭) আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া ও সৃষ্টি জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৮) জাগতিকভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের উত্তম উপায়।

সাহরী খাওয়া :

রোযা রাখার জন্য সাহরী খাওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

'তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।' (বোখারী শরীফ-১৯২৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

'আমাদের ও ইহুদি-খ্রিস্টানদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম শরীফ-২৬০৪)

☆ দেরি করে সাহরী খাওয়া :

সাহরীর অর্থ হলো, যা কিছু রাতের শেষভাগে খাওয়া হয়। সুন্নাত হলো, দেরি করে সাহরী খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে সাহরী খেলে রোযা রাখতে অধিকতর সহজ হয়, ফজরের নামায আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহরী শেষ করা সুন্নাত নয়। সাহরীর সময় শেষ হলো কি না, তা জানার উপায় হলো স্বচক্ষে পূর্বাকাশের শুভ্রতা দেখা, অথবা নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডার ও নির্ভুল ঘড়ির মাধ্যমে অবগত হওয়া।

☆ ইফতারে বিলম্ব না করা :

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আগমন ঘটে ও ইফতার করার সময় হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'মানুষ যত দিন পর্যন্ত সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন কল্যাণের সাথে থাকবে।' (বোখারী শরীফ-২৮৫২)

তিনি আরো বলেছেন,

لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

'যত দিন মানুষ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইফতারে দেরি করে।' (আবু দাউদ শরীফ-২৩৫৫)

যে সকল খাদ্য দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব :

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুর না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।' (মুসনাদে আহমদ ১৩০১২)

☆ ইফতারের সময় দু'আ করা :

রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়। কারণ ইফতারের সময়টা হলো বিনয় ও আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণের চরম মুহূর্ত। এ সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের মুহূর্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এটা রমাজানের প্রতি রাতে। প্রত্যেক রোযাদার বান্দার দু'আ কবুল হয়।' (বায়হাকী-৩৬০৫)

ইফতার করার পর এ দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

অর্থ: 'পিপাসা নিবারণ হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নির্ধারিত হলো।'

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ :ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

(আবু দাউদ শরীফ ২৩৫৭)

রোযা রাখা যাদের ওপর ফরজ :

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকীম, সুস্থদেহী মুসলিমের জন্য রোযা রাখা ফরজ।

যে ব্যক্তি এ সকল শর্তের অধিকারী তাকে অবশ্যই রমাজান মাসে রোযা রাখতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে।' (বাকারা ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'যখন তোমরা রমাজানের চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে।' (মুসলিম শরীফ-১০৮১)

রমাজানের শেষ দশকের ফজীলত ও তাৎপর্য :

রমাজান মাসের শেষ দশকের বিশেষ ফজীলত রয়েছে এবং আছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন :

☆ এই ১০ দিনের মাঝে রয়েছে কদর নামের একটি রাত, যা হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে এ রাতে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে ইবাদত-বন্দেগি করবে তার অতীতের পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ রাতে ইবাদত-বন্দেগিতে বেশি সময় ও শ্রম দিতেন, যা অন্য কোনো রাতে দেখা যেত না। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে তিনি এ রাতে কোরআন তেলাওয়াত, যিকির, নামায ও দু'আর মাধ্যমে জাগ্রত থাকতেন। এরপর সাহরী গ্রহণ করতেন।

☆ রমাজানের শেষ দশক এলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাত জাগরণ করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। যেমন বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি এই ১০ দিনের রাতে মোটেই নিদ্রা যেতেন না। পরিবারের সকলকে তিনি এ রাতে ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য জাগিয়ে দিতেন।

☆ এই ১০ দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দিনগুলোতে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। প্রয়োজন ব্যতীত তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন না।

রোযার কতিপয় আধুনিক মাসআলা :

* রোযা রেখে দিনেরবেলায় কয়লা চিবিয়ে বা মাজন দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ এবং এর কিছু অংশ যদি কণ্ঠনালির নিচে চলে যায়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কাঁচা বা শুকনা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা জায়েয। এমনকি যদি নিমের কাঁচা ডালের মিসওয়াক করা হয় এবং তার তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভূত হয়, তবুও মাকরূহ হবে না। (বেহেশতি জেওর : ৩/১৩, মারাকিউল ফালাহ : ২১০)।

* রোযা অবস্থায় ফুকাহায়ে আহনাফ

মিসওয়াক করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারের অবস্থা এ থেকে ভিন্ন। এর মধ্যে অনেক স্বাদ অনুভব হয়। তাই টুথপেস্ট ও টুথ পাউডারকে মিসওয়াকের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় করার জন্য এগুলোর প্রয়োজনও হয় না। এ জন্য এগুলো ব্যবহার করা মাকরূহ। (জাদিদ ফেকহি মাসায়েল : ১/১০২)।

* রোযার মধ্যে দাঁত তোলা অথবা দাঁতের ওষুধ লাগানো জায়েয আছে। তবে প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ মাকরূহ, যদি রক্ত অথবা ওষুধ পেটের ভেতরে চলে যায় এবং থুথুর চেয়ে বেশি পরিমাণে হয় অথবা থুথুর সমান হয় অথবা তার স্বাদ অনুভব হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। তবে এতে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

* রোযার মধ্যে হুক্কা খেলে রোযা ভেঙে যায়। তবে এর ফলে কেবল কাযা আবশ্যক হবে। আর কোনো কোনো অবস্থায় কাফফারা ও কাযা উভয়টা আবশ্যক হবে। যেমন–যদি সে এটা উপকারী মনে করে খায়। এ বিধান বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির বেলায়ও প্রযোজ্য। (রাদ্দুল মুহতার : ২/১৩৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ২/৪১৯)।

* ইনজেকশন দ্বারা যেসব বস্তু শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তা সাধারণত রগের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক অথবা পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয়। আর এমন একটি রাস্তা দিয়ে তা অতিক্রম হয়, যা তার প্রকৃত রাস্তা। ফিকহের কিতাবসমূহের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এ কথা অনুভব হয় যে ফোকাহায়ে কিরামে এ ধরনের অবস্থাকে রোযা ভঙ্গকারী আখ্যায়িত করেনি।

সারকথা হলো, ইনজেকশনের মাধ্যমে অস্বাভাবিকভাবে চাই রক্ত ঢোকানো হোক অথবা ওষুধ ঢোকানো হোক, তা রোযা ভঙ্গের কারণ হবে না। কেননা গ্লুকোজ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য এটাই–তা রগের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। পাকস্থলী অথবা মস্তিষ্কের কোনো প্রবেশদ্বারের মাধ্যমে পৌঁছানো হয় না, এ জন্য রোযা ভাঙবে না। (জাদিদ ফিকহি মাসায়েল : ১/৯৬)।

* রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যায়। তাই সাহরীর শেষ সময় ও ইফতারের প্রথমে ইনহেলার ব্যবহার করলে যদি তেমন অসুবিধা না হয়, তবে রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা জরুরি; কিন্তু অসুস্থতা বেশি হওয়ার কারণে যদি দিনেরবেলায়ও ব্যবহার করা জরুরি হয়, তাহলে তখন ব্যবহার করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো–

১. ওই ওজরে দিনেরবেলা ইনহেলার ব্যবহার করলেও অন্যান্য পানাহার থেকে বিরত থাকবে।

২. পরবর্তী সময়ে রোগ ভালো হলে এর কাযা করে নেবে।

৩. আর ওজর যদি আজীবন থাকে, তাহলে ফিদয়া আদায় করবে। (সূরা বাকারা : ১৮৪, রদ্দুল মুখতার : ২/৩৯৫)।

* হস্তমৈথুন কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করার দ্বারা বীর্যপাত ঘটালে রোযা ভেঙে যাবে। তবে এ কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে না; বরং শুধু একটি রোযা কাযা করে নিলেই হবে। (ফাতওয়ায়ে আলমগিরী : ১:২০২ পৃষ্ঠা; ফাতওয়ায়ে রাহিমিয়া : ৭:২৯৩ পৃষ্ঠা)।

* রমাজানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফরের কারণে কোনো ব্যক্তির রোযা যদি ২৭ বা ২৮টি হয়ে যায়, অর্থাৎ ২৭-২৮টি রোযা রাখার পর সে দেশে ঈদের চাঁদ উদিত হয়ে যায়, তাহলে তার কর্তব্য হলো, ওই দেশের লোকের মতো সেও রোযা ছেড়ে দেবে এবং সবার সঙ্গে ঈদ করবে। পরবর্তী সময়ে আরো দুই বা একটি রোযা কাযা করে নেবে। (ফাতওয়ায়ে রাহিমিয়া ৭/২১৫; ফাতওয়া লাজনাতিদ দাইমা ১০/১২৭)। তদ্রূপ এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফরের কারণে কারো রোযা যদি ৩০টির বেশি হয়ে যায়। যেমন–কেউ রমাজানের শুরুতে সৌদি আরব ছিল, সেখানে বাংলাদেশের এক-দুই দিন আগেই রোযা শুরু হয়েছে। এরপর শেষের দিকে বাংলাদেশে এল। তার রোযা ৩০টি হলেও বাংলাদেশে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হলো রমাজানের সম্মানার্থে রোযা রাখা এবং লোকদের সঙ্গে একত্রে ঈদ করা। (ফাতওয়ায়ে রাহিমিয়া ৭/২১৫)।

* রোযা অবস্থায় বিমানে পশ্চিম দিকে সফর করার কারণে যদি দিন বড় হয়ে যায়, তাহলে তার অবস্থানস্থলে যখন সূর্যাস্ত হবে তখনই ইফতার করবে, এর আগে ইফতার করা বৈধ হবে না। অবশ্য রোযা রাখা বেশি কষ্টকর হয়ে গেলে তার জন্য রোযা ভেঙে ফেলার অনুমতি আছে। তবে পরবর্তী সময়ে এ রোযাটি কাযা করে নিতে হবে।

* রোযা অবস্থায় কানের ভেতর তেল, ড্রপ বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে। এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না। তদ্রূপ কানের ভেতর পানি চলে গেলেও রোযা ভাঙবে না।

* নাকে ড্রপ, স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহারের পর তা যদি গলার ভেতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে, অবশ্য গলায় না গেলে বা স্বাদ অনুভূত না হলে রোযা ভাঙবে না। (মাজাল্লাতু মাজমাইল

ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৪৫৪)।

* অক্সিজেন নিলে রোযা ভাঙবে না। (ফিকহুন নাওজাজিল ২/৩০০)।

* ইনজেকশন, ইনসুলিন ও স্যালাইন নিলে রোযা ভাঙবে না। (আলাতে জাদিদা কি শরয়ী আহকাম ১৫৩)।

* নাইট্রোগ্লিসারিন অ্যারোসলজাতীয় ওষুধ হার্টের রোগীরা ব্যবহার করে। ডাক্তারের মতে, ওষুধটি জিহ্বার নিচে ২-৩ ফোঁটা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে শিরার মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এ হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করার পর গলায় ওষুধ না গেলে বা এর স্বাদ না পৌঁছলে রোযা ভাঙবে না (ফিকহুন নাওয়াজিল ২/২৯৯)।

* রোযা অবস্থায় রক্ত দেওয়া-নেওয়া দুটিই জায়েয। এর কারণে রোযা ভাঙবে না। তাই ডায়ালিসিসের কারণে রোযা ভাঙবে না। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে রোযা অবস্থায় রক্তদান মাকরূহ। (ফিকহুল নাওয়াজিল ২/৩০০)।

লাইলাতুল কদর কখন?

পবিত্র কোরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোনটি। তবে কোরআনের ভাষ্য হলো, লাইলাতুল কদর রমাজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমাজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে এবং এ রজনী রমাজানের শেষ দশকে হবে বলে হাদীসে এসেছে এবং তা রমাজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদীসে বর্ণিত।

'তোমরা রমাজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।' (বোখারী শরীফ-১৮৭৪)

এবং রমাজানের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর থাকার সম্ভাবনা অধিকতর। যেমন হাদীসে এসেছে 'যে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করতে চায় সে যেন শেষ সাত দিনে অন্বেষণ করে।' (বোখারী শরীফ-১৮৭৩)

অধিকতর সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রথম হলো, রমাজান মাসের ২৭ তারিখ। দ্বিতীয় হলো, ২৫ তারিখ। তৃতীয় হলো, ২৯ তারিখ। চতুর্থ হলো, ২১ তারিখ। পঞ্চম হলো, ২৩ তারিখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতকে গোপন রেখেছেন আমাদের ওপর রহম করে। তিনি দেখতে চান এর বরকত ও ফজীলত লাভের জন্য কে কত প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

লাইলাতুল কদরে আমাদের করণীয় হলো বেশি করে দু'আ করা। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লাইলাতুল কদরে আমি কী দু'আ করতে পারি? তিনি বললেন, এই দু'আ করে–

اَللّٰهُم إِنَّكَ عَفُوٌّ تحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালোবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।' (ইবনে মাজাহ-১৯৮২)

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব :

এ রাতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ(١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْـلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْـرٍ (٣)تَـنَـزَّلُ الْـمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِـإِذْنِ رَبِّهِـمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এক মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কী জানো? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতেই ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।'

এ সূরাতে যে সকল বিষয় জানা গেল তা হলো :

☆ এ রাত এমন এক রজনী, যাতে মানবজাতির হেদায়াতের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে।

☆ এ রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের চেয়েও এর মূল্য বেশি।

☆ এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে থাকে।

☆ এ রজনী শান্তির রজনী। আল্লাহর বান্দারা এ রাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি অর্জন করে থাকে।

☆ সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এ আয়াতগুলোতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হলো। যত সময় তত বেশি কাজ করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না।

☆ গোনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা লাভ। এই রাতের ফজীলত সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'যে লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে নামায আদায় ও ইবাদত-বন্দেগি করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বোখারী শরীফ ১২৬৬)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

মৃত ব্যক্তির খবর কবর জগতে ছড়িয়ে পড়ে :

দুনিয়া থেকে কোনো ব্যক্তি বিদায় নিলে বরযখ তথা কবরজগতে সব দিকে তার খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারা পূর্ব থেকে সেখানে আছেন, তাঁরা সকলে মৃত ব্যক্তিকে স্বাগত জানান। যেমন দুনিয়াতে হাজী সাহেবানদের ইস্তিকবাল করা হয়, সেরূপ অবস্থা সেখানে সৃষ্টি হয়। দুনিয়াতে যেমন স্বাগত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে থাকেন, আত্মীয়-স্বজন কেমন আছে? অমুক ব্যক্তি কেমন আছে? সেখানেও সেরূপ হয়ে থাকে। সে কারণে আমরা মাদরাসার ছাত্রদেরকে একটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকি। ছাত্রদের কাছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তবে সে উত্তর দেবে, আমার অস্থায়ী বাড়ি তো অমুক স্থানে (যেখানে তার বাড়ি, সেই নাম বলবে) আর স্থায়ী বাড়ি হলো জান্নাত। যদি বলা হয়, ওই স্থানের স্টেশন কোথায়? তখন বলে থাকে এর স্টেশন হলো কবর। ওই বাড়িতে যাওয়ার বাহন কী? উত্তরে বলবে, কবরের স্লিপারে শুয়ে শুয়ে পৌঁছে যাই। যদি প্রশ্ন করা হয়, ওই সফরটি সহজ কিভাবে হবে? বলা হবে, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার মাধ্যমে। সেটা চলবে কিভাবে? বলা হবে, আমলের মাধ্যমে। এরূপ কথাবার্তায় আসল বাড়ির ব্যাপারে মানুষ পরিচিত হয় এবং এর প্রতি আকর্ষণ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অস্থায়ী বসবাসের জন্য যেমন মানুষ বিভিন্নভাবে আয়োজন করে থাকে, তেমনি আসল বাড়ির জন্যও সমূহ আয়োজন জরুরি।

দুনিয়া থেকে কেন চলে যেতে হবে?

দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া আবশ্যক। কারণ এখানে যদি শুধু আগমনই ঘটতে থাকে আর যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে দুনিয়াতে জায়গার সঙ্কুলান হবে না। থাকার জায়গাটুকুও পাওয়া যাবে না। দুনিয়াটা তো পরিবর্তনশীল। সুতরাং মানুষ বুড়ো হবে। বুড়োর সংখ্যাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যদি তাদের বিদায় নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, তবে একসময় যুবকের সংখ্যা কমে যাবে, বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। একসময় তাদের খেদমত করার লোক পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। সেই কারণে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে।

আল্লাহ তা'আলার হিকমাত :

দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া না নেওয়ার বিষয়টি আল্লাহর হাতেই রেখেছেন। কারণ এটি যদি বান্দার হাতে দেওয়া হতো তবে দুনিয়াটা ঝগড়া-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হতো। কারণ প্রত্যেকেই চাইত, তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকেই দুনিয়াতে রাখবে। এই ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার জন্য রাজি হতো না। তাই আল্লাহ তা'আলার বড়ই হিকমত হলো, তিনি এই বিষয়টি নিজের আয়ত্তে রেখেছেন। যার জন্য যতটুকু সময় তিনি ভালো মনে করেন, তত দিন এখানে রাখেন, যখন ইচ্ছা তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যান।

পেরেশানিকে সহজ করার পদ্ধতি :

সাধারণত বৃদ্ধরাই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় ছোটরাও বৃদ্ধের আগে বিদায় নিয়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর ক্ষেত্রে এই নজির স্থাপন করা হয়েছে যে তাঁর বড়রাও বিদায় নিয়ে গেছেন, তাঁর ছোটরাও আগে বিদায় নিয়ে গেছেন। প্রথমে মাতা-পিতার ছায়া উঠে গেল। চাচার ছায়া থেকে বঞ্চিত হলেন, দাদার ছায়া থেকে বঞ্চিত হলেন। এই অবস্থা ঘটেছে স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর সাথে। সুতরাং দুনিয়াতে যাদের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি ও নিকটাত্মীয়রা বিদায় নিয়ে গেছেন তারা রাসূল (সা.)-এর এই অবস্থা দেখে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। তাদের পেরেশানি দূর করতে পারবে। কখনো এমন হয় যে বড়রা থেকে গেছেন, তাঁদের সামনেই তাঁদের ছোটরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। তার জন্যও রাসূল (সা.)-কে নমুনা বানানো হয়েছে যে তাঁর ছেলেমেয়ে তাঁর উপস্থিতিতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যেসব মহিলার স্বামী আগে ইন্তেকাল হয়েছে তাদের জন্য নজির রাসূল (সা.)। কারণ রাসূল (সা.) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তথা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের দুনিয়াতে রেখে ইন্তেকাল করেছেন। কারো স্ত্রী আগে ইন্তেকাল করলে তার জন্যও নজির রয়েছে রাসূল (সা.)-এর মধ্যে। কারণ রাসূল (সা.) দুনিয়াতে থাকতেই তাঁর পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং দুনিয়াতে যাদেরই এরূপ পেরেশানিতে পড়তে হয় তাদের উচিত, রাসূল (সা.)-এর এসব ঘটনার দিকে তাকানো এবং এর মাধ্যমে নিজের পেরেশানিতে অনেকটা সহজতা আসবে। চিন্তা দূর হবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত

আলহামদু লিল্লাহ, দীর্ঘ মেহনতের পর আজ অনেকেই দরসী সালকে আল বেদা বলার জন্য প্রস্তুত। এই সময় যেকোনো দ্বীনি জামি'আতে সমাপনী বর্ষের বিশেষ করে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের আবেগ-অনুভূতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করলে দেখা যাবে তাদের চিন্তাধারা ও মনোভাব এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন।

ফুযালাদের মনোভাব :

১। অনেক ফুযালাদের দেখা যায় সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত।

২। অনেককে দেখা যায় যারপরনাই অস্থির-দোদুল্যমান।

৩। অনেকে শিক্ষার দীর্ঘ সফরকে এখানেই শেষ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

৪। আবার অনেকে আরো শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতিতে মগ্ন।

৫। অনেকে নিজেকে পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দেয় 'যা হওয়ার হবে'। মূলত তারা উদ্দেশ্যহীন সিদ্ধান্তহীন।

৬। কিছুসংখ্যক ফুযালা এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিজের অভিভাবক ও উস্তাদদের হাতে ন্যস্ত করে থাকে।

৭। এক শ্রেণীর ফুযালা এমনও রয়েছে, যাদের চাহিদা, আকর্ষণ, অনুরাগ নিজেদের উস্তাদদের চাহিদা ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের ফুযালারা সাধারণত অন্যদের তুলনায় বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

তবুও একই সুতায় গাঁথা :

শিক্ষার শেষ প্রান্তে এসে অধিকাংশ ফুযালার চিন্তা-চেতনা ভিন্ন ভিন্ন ধারার বটে। তবুও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-চেতনা এক ও অভিন্ন এবং এক সুতায় গাঁথা। যেমন–

১.ব্যক্তিগতভাবে যেকোনো চেতনার লালনকারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় উস্তাদদের মতামত ও সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেবে এবং মনেপ্রাণে মেনে নেবে।

২। নিজের প্রতিষ্ঠান ও মাদরে ইলমীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মিশনের বাস্তবায়নে নিজেকে ফানা করে দিতে সদা প্রস্তুত।

৩। তাদের অধিকাংশই নিজের জীবন ও অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বীনের খিদমত, প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনের ওপর অশুভ আক্রমণকে প্রতিহত করা মনে করে।

৪। কায়কারবার, পদ-পদবি এবং দুনিয়ামুখী হওয়া তাদের পছন্দের তালিকাবহির্ভূত।

তিনটি পরামর্শ :

শিক্ষার শেষ ধাপের মুহূর্তটি ফুযালাদের জন্য বড়ই কঠিন। প্রত্যেক ফাযেলের অন্তরেই লুকায়িত থাকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রশ্ন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ফুযালাদের সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় তাদের সামনে তিনটি কথা পেশ করছি।

মূলত একজন ফাযেলকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে করতে হবে পরামর্শ। এরপর নিতে হবে সিদ্ধান্ত। পরামর্শ থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে খুঁজতে হবে তিনটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ১.

একজন ফাযেলের জন্য পরামর্শ করার আগে কী করতে হবে?

উত্তর খুব সহজ। পরামর্শ করার আগে পরামর্শের প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত ফুযালারা একটি ভুলের শিকার হয়। তারা মনে করে তাসলীম, রেজা এবং উস্তাদদের ওপর আস্থার উদ্দেশ্য হলো, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বয়ং নিজে কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা যাবে না। এ ধরনের আবেগী মনোভাব নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মোটেই ঠিক নয়। আ রে ভাই! নিজের ব্যাপারে নিজের যতটুকু জ্ঞান আছে, অন্যজন তা কিভাবে জানবে। আর জানলেই বা কতটুকু জানবে? তুমি তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি, জরুরত, হাজত, সমস্যা, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খুব ভেবে-চিন্তে নির্ণয় করো তোমাকে কী করতে হবে এবং কী বুনতে হবে। তাদরীস, তাখাসসুস নাকি অন্য কিছু? প্রথমেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে ভবিষ্যৎ কর্মের একটি খসড়া তৈরি করে নাও। অতঃপর স্তরবিন্যাস করে নিজের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য দিকটি নির্ণয় করো। এই ধাপ অতিক্রম করার পরই তুমি পরামর্শ করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এবার তুমি তোমার মুহতারাম উস্তাদের সামনে নিজের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাধান্য দেওয়া বিষয়গুলো পেশ করো। সব দিক সামনে রেখে তিনি যখন পরামর্শ দেবেন, আশা করি তা ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ২.

পরামর্শ কার সাথে করবে?

বাস্তব সত্য হলো, প্রত্যেক উস্তাদ ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু হোন। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু তোমার ভবিষ্যতের ভিত্তি নিয়ে, তাই পরামর্শক তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তবে তা ভেবে-চিন্তে হতে হবে। শুধুমাত্র আকীদত মুহাব্বত দিয়ে নয়। কান

পেতে খুব গুরুত্বসহ শোনো, পরামর্শ তার সাথেই করবে, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে।

১। মুশীর তথা পরামর্শদাতা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সার্বিকভাবে অবগত হতে হবে। তা তোমার জানানোর মাধ্যমেই হোক না কেন।

২। তুমি যে ব্যাপারে পরামর্শ নিতে চাও, তিনি সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য হতে হবে। যেমন–ইসলামী অর্থনীতির ওপর কোর্স করা অতি প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগীও বটে। এ ব্যাপারে যিনি সম্যক অবগত নন, তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না।

৩। যেমনিভাবে মুশীরের প্রতি তোমার আকীদত মুহাব্বত থাকা প্রয়োজন, তেমনি তোমার প্রতিও তিনি স্নেহশীল হওয়া আবশ্যক।

উপরোল্লিখিত তিনটি গুণের একটিও যদি কোনো মুশীরের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার সাথে পরামর্শ করা নিরর্থক হবে। ভেস্তে যাবে তোমার যাবতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। নড়বড়ে হয়ে যাবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত। অতএব তুমি তোমার ব্যাপারে যা জানো তদানুযায়ী তোমাকেই উপযুক্ত মুশীর নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মূলনীতিগুলো সামনে রেখে অগ্রসর হলে ইনশাআল্লাহ কখনো অনুতপ্ত হতে হবে না।

প্রশ্ন ৩.

পরামর্শ করার পর কী করতে হবে?

উত্তর সহজ, পরামর্শের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা। কারণ তুমি পরামর্শের যাবতীয় মূলনীতি মেনে যখন মুশীর ঠিক করবে, তখন তার মতামত ও পরামর্শের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখাই হবে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা।

আকাবীরের সাথে জুড়ে থাকা :

এত দিন তোমরা উস্তাদদের স্নেহতলে ছিলে। এখন মাদরাসার চার দেয়াল ছেড়ে বের হলেই দেখবে চারদিকে অসংখ্য ফেতনার কালবৈশাখী ঝড়, গোমরাহীর নতুন নতুন ধরন সমাজে বিস্তার লাভ করছে। ধেয়ে আসছে অসংখ্য ইলমী, ফিকরী এবং মালের ফেতনা।

বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় আকাবীর বুজুর্গদের সাথে জুড়ে থাকা। নওজোয়ান ফুযালাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ানক ফেতনার কারণ আকাবীরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। আমার সামনে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, বিকৃত দর্শনের ধবজাধারীরা অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ফুযালাকে আকাবীরের পথ থেকে হটিয়ে পথভ্রষ্ট করে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে। অতএব তোমাদের কর্মক্ষেত্র যা-ই হোক, যেখানেই হোক, দৃঢ়ভাবে আকাবীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। ইনশাআল্লাহ সফলকাম হবে।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের করণীয়

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতেয়ারধারী, তাদেরও।" (সূরা নিসা-৫৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিন সত্তার 'ইতাআত' বা অনুসরণ করতে বলেছেন :

১. আল্লাহ তা'আলার, অর্থাৎ কোরআনে কারীমের। ২. নবীজি (সা.)-এর, অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের (এবং সুন্নাতের ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরামের)। ৩. উলামায়ে কেরাম এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় নেতার। (আয়াতের মধ্যে 'এখতেয়ারধারী' দ্বারা এ দু শ্রেণীই উদ্দেশ্য। দ্রষ্টব্য : তাফসীরে ইবনে কাসীর' সূরা নিসা-৫৯)

তবে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের অনুসরণের জন্য শর্ত হলো যে, তারা 'হক' (সত্য ও সঠিক পথ ও মত)-এর ওপর থাকতে হবে। যদি তারা হকের ওপর না থাকে, কোনো ভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়, অথবা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো নাজায়েয কাজের হুকুম দেয়, তবে সে উলামায়ে কেরাম এবং রাষ্ট্রীয় নেতার 'ইতা'আত' করাও কারো জন্য বৈধ নয়। সহীহ বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজি এক আনসারী ব্যক্তিকে একটি ছোট দলের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন এবং লোকদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। উক্ত ব্যক্তি অধীন সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাঁর 'ইতা'আত'-এর স্বীকৃতি নিয়ে লাকড়ি জমা করতে এবং আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর যখন আগুন জ্বালানো হলো, তখন উক্ত ব্যক্তি অধীন সাহাবায়ে কেরামকে আগুনে প্রবেশ করার আদেশ প্রদান করলেন! কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ অবস্থায় তাঁর 'ইতা'আত' থেকে বিরত থাকলেন এবং বিষয়টি নবীজির কাছে গিয়ে উত্থাপন করলেন। তখন নবীজি বললেন, "যদি তোমরা আগুনে প্রবেশ করতে, তবে কেয়ামত পর্যন্ত আর তা থেকে বের হতে পারতে না। 'ইতা'আত' কেবল শরীয়তসম্মত বিষয়ে বৈধ আছে"। (বোখারী শরীফ-৪৩৪০)

সারকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে : (১) কোনো স্থানের 'ইতা'আত' বৈধ নয়। যদিও তা অনেক বরকতময় হোক না কেন। কেননা, তা উল্লিখিত তিন শ্রেণীসত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। (২) কোনো জাহেল বা অজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ বৈধ নয়। (৩) কোনো আলেমের 'ইতা'আত' করা ততক্ষণ বৈধ হবে, যতক্ষণ সে হকের ওপর থাকবে।

বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগে যে ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে, তার কারণ হলো, আমাদের এক শ্রেণীর ভাইয়েরা এ ক্ষেত্রে তিনটি ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

ক. তাঁরা বলছেন, 'আমরা নেজামুদ্দিনের ইতআতে আছি এবং থাকব।' এ কথাটি উক্ত আয়াতের সাথে সংঘর্ষিক এবং সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেননা কোনো স্থান কখনো কাউকে হেদায়েত দিতে পারে না। হ্যাঁ, ব্যক্তি হেদায়েতের মাধ্যম হতে পারে, যতক্ষণ সে হকের ওপর থাকবে। আর এ 'নেজামুদ্দিনের ইতআত'-এর অর্থ যদি এটা হয় যে, "মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) যেহেতু নেজামুদ্দিন থেকে এ মোবারক মেহনত শুরু করেছেন, কাজেই নেজামুদ্দিনের নেতৃত্বে যে-ই আসবে, আমরা তারই অনুসরণ করব।" তবে এ অর্থও নিঃসন্দেহে ভুল। কেননা নবীজি তো দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেছিলেন মক্কা-মদীনায়, কিন্তু তাই বলে কি কোরআনে কিংবা হাদীসে মক্কা-মদীনাকে স্থান হিসেবে এ মর্মে অনুসরণের বৈধতা দেওয়া হয়েছে যে মক্কা-মদীনা থেকে যে যা-ই বলুক, যদিও তা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী হয়, তবুও তার অনুসরণ করতে হবে! কখনোই নয়। কাজেই 'নেজামুদ্দিনের ইতা'আতে আছি'–এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা এবং উক্ত আয়াতের বিরোধী।

খ. দ্বিতীয় ভ্রান্তি হলো, দাওয়াত ও তাবলীগ একটি দ্বীনি কাজ হওয়া সত্ত্বেও তারা এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা মানছে না। তাদের ধারণা হলো, দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ প্রচার-প্রসার লাভ করার পেছনে উলামায়ে কেরামের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই; বরং পৃষ্ঠপোষকতা

রয়েছে সাধারণ জনসাধারণের। এ ধারণার ভিত্তিতে তারা দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের অনুসরণ করাকে 'নেজামুদ্দিনের ইতা'আত' নাম দিয়ে এটাকে শরীয়তের অনুসরণ মনে করছে এবং উলামায়ে কেরামের ওপর 'বদগুমানী' (খারাপ ধারণা) করছে। তাদের এ কর্মপন্থা নিঃসন্দেহে গোমরাহী! কেননা এ কাজ উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় উৎকর্ষতা অর্জন করেছে এবং এখনো তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই তা টিকে আছে। কোনো দ্বীনি কাজ উলামায়ে কেরামের সমর্থন ছাড়া কখনোই টিকে থাকতে বা প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয় না। মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) নিজে আলেম ছিলেন, তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), মাওলানা খরীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সোহবতে ও থানভী (রহ.)-এর প্রত্যক্ষ পরামর্শে এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.), মুফতীয়ে আজম শফী (রহ.), দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা কারী তাইয়েব সাহেব (রহ.), দিল্লির আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.), সাহারানপুর মুযাহিরুল উলূম মাদরাসার নাযিম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব (রহ.), দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ই'যায আলী সাহেব (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহ.)সহ সমকালীন সকল বুজুর্গানে দ্বীনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁদেরই পরামর্শমতো এ কাজের নকশা নির্ধারণ করেছেন। মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) নিজেই বলেছেন, "এ কাজের বরকত মূলত হযরত (থানভী রহ.)-এর দু'আরই ফসল! সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) আওর উনকি দ্বীনি দাওয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত মাওলানার ধারণায় (দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে) এই সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরি ছিল, যা ছাড়া তিনি এই কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক মনে করতেন। এসব বিষয় চিন্তা করেই হযরত মাওলানা প্রথম জামাতের সফরের জন্য নিজ মাতৃভূমি কান্ধলাকে নির্বাচন করলেন। কেননা কান্ধলা ছিল তদানীন্তন যুগের একটি বিশেষ ইলমী মারকায এবং তাঁর নিজের শহর। (বিস্তারিত দেখুন দ্বীনি দাওয়া, ৫৭, ৮০, ১১৪, ১১৫, ১২৬, ১২৭), (তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-১৭৩)

বাংলাদেশেও এ কাজ শুরু করেছিলেন হযরত শামসুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.), (সদর সাহেব হুজুর), বাগেরহাটের মাওলানা আব্দুল আজীজ (বড় হুজুর) (রহ.)-এর মাধ্যমে। যদ্দরুন বাংলাদেশে তাবলীগের প্রথম মারকায ছিল বর্তমান বাগেরহাটের উদয়পুরে। কাজেই তাবলীগের এ কাজ প্রচার-প্রসার লাভ করার পেছনে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা নেই–এ কথা নিঃসন্দেহে গলদ! দ্বিতীয়ত, অন্ধ ব্যক্তি কখনো কাউকে রাস্তা দেখাতে পারে না। অন্ধকার কখনো অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হয় না। মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) বলে গেছেন, "এই সিলসিলায় একটি উসূল এই যে স্বাধীনভাবে ও নিজের মনমতো না চলা। বরং নিজেকে ওই সমস্ত বুজুর্গের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা, যাঁদের ওপর দ্বীনি বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী আকাবীর হযরতগণ আস্থা রেখে গেছেন।" এরপর হযরত বলেছেন, "দ্বীনের কাজে আস্থা রাখার জন্য বহু সতর্কতা ও হুঁশিয়ারির সাথে (অনুসৃত ব্যক্তি) নির্বাচন করা জরুরি। অন্যথায় অনেক বড় ধরনের গোমরাহীর আশঙ্কা রয়েছে।" (মনযুর নোমানী (রহ.) কৃত 'মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ-১৪৩)। কাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের এ দ্বীনি কাজে সাধারণ জনগণের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, অন্ধের অনুসরণ করা, যা নিঃসন্দেহে গোমরাহী)!

গ. আরেকটি ভ্রান্তি হলো, আমাদের এক শ্রেণীর ভাইয়েরা এখনো মাওলানা সা'আদ সাহেবকে অনুসরণীয় মনে করছেন! অথচ সা'আদ সাহেব থেকে এমন অনেক বক্তব্য এবং কর্মপদ্ধতি পাওয়া গেছে, যা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী! মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) যে মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন, সেই দারুল উলূম দেওবন্দসহ পুরো বিশ্বের উলামায়ে কেরাম সা'আদ সাহেবের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সা'আদ সাহেব এখনো যথাযথভাবে সে ভুল থেকে ফিরে আসেননি। কাজেই বর্তমানে মাওলানা সা'আদ সাহেবের অনুসরণ করা জায়েয হতে পারে না। মাওলানা সা'আদ সাহেবের প্রতি উলামায়ে কেরামের আস্থা না থাকার মৌলিক কারণগুলো হলো : (১) দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী ও মূলধারার আলেমগণের ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক। (২) তাবলীগের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তাবলীগ ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য মেহনতকে (যেমন, মাদরাসা শিক্ষা, তাসাউফ ইত্যাদি) হেয় এবং গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করা। (৩) পূর্ববর্তী মুরব্বিদের

কাজের ফলপ্রসূ উসূল থেকে সরে যাওয়া। এ তিনটি বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বিস্তারিতভাবে তাঁদের অভিযোগ ও আপত্তি পেশ করেছেন।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে, কাজেই জীবিত কোনো মানুষের ব্যাপারে এমন ধারণা না করা জরুরি যে, তার থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো এমনভাবে অনুসরণ না করে যে, সে (অনুসৃত ব্যক্তি) ঈমান আনলে সেও (অনুসরণকারী ব্যক্তিও) ঈমান আনে। সে কুফরী করলে সেও কুফরী করে। যদি কাউকে অনুসরণ করতেই হয়, তবে মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করো। কেননা জীবিতগণ ফেতনার আশঙ্কামুক্ত নন।' (তাবারানী কাবীর-৮৭৬৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৮৫০)

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 'আন নূর' পত্রিকায় একটি কলাম এ জন্য বরাদ্দ করেছিলেন যে, যে বিষয়গুলোতে কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী দলিল-প্রমাণের আলোকে হযরতের ভুল ধরে দেবেন। হযরত উক্ত কলামে সে ভুল স্বীকারকরত সংশোধনী দেবেন। মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) একবার নবাগত এক দাড়িহীন যুবকের চোয়ালে হাত বুলিয়ে দাড়ি রেখে দেওয়ার অনুরোধ করলে যুবকটি যখন হযরতের সোহবতে আসা বন্ধ করে দিল তখন ইলিয়াছ (রহ.) নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, "আমি ঠাণ্ডা তাওয়ায় মাছ ঢেলে দিয়েছি।" অর্থাৎ তাওয়া গরম হওয়ার পর তাতে মাছ দিলে তা ভুনা করা সম্ভব, অন্যথায় ভুনা হবে না।

আলেমগণ নিজেদের লিখিত সকল কিতাবের ভূমিকায় এ কথা লিখে দেন যে, এ কিতাবকে ত্রুটিমুক্ত করতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তদুপরি কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই যদি তাতে কোনো ভুল দেখতে পান, তবে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেব।

কাজেই মানুষ থেকে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে ভুলকে চলতে দেওয়া যাবে না; বরং ধরিয়ে দিতে হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে যে এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য 'আয়না'স্বরূপ। আর ধরিয়ে দেওয়ার পর ভুলের শিকার ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, (ক) ভুল মেনে নেওয়া। (খ) ভুল গোপনে করে থাকলে গোপনে আর প্রকাশ্যে করে থাকলে প্রকাশ্যে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে সঠিক বিষয়টির ঘোষণা করে দেওয়া। সাহাবী হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে নবীজি অসিয়ত করে বলেন, "তুমি প্রকাশ্যে (গোনাহ) হলে প্রকাশ্যে (তাওবা করো), গোপনে (গোনাহ) হলে গোপনে (তাওবা করো)। (তাবরানী কাবীর-৩৩১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১৬৭৫) (গ) যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছে তার শোকর আদায় করা যে ভাই, তুমি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে উপকার করেছো, অন্যথায় যারা যারা আমার দেখাদেখি আমল করত, তাদের সকলের দায়ভার আমার ওপর আসত!

মাওলানা সা'আদ সাহেব তাঁর প্রতি উলামায়ে কেরামের অনাস্থার বিষয়ে রুজুর কথা বললেও যথাযথভাবে তিনি রুজু করেননি। (যদ্দরুন নেজামুদ্দিনের প্রবীণ মুরব্বিরা এখনো নেজামুদ্দিনে ফিরে আসেননি।) কেননা প্রথমত, দারুল উলূম দেওবন্দের কাছে কিছু বিষয়ে রুজু করলেও আম মজমার মধ্যে প্রকাশ্যে তিনি এখনো নিজের সব ভুল স্বীকার করে সঠিক বিষয়ের ঘোষণা দেননি। দ্বিতীয়ত, দারুল উলূম দেওবন্দের কাছে রুজু করার ক্ষেত্রে কেবল একটি ঘটনার [হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা] ব্যাপারে দেওবন্দ তাঁর রুজু গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছে, অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ে দেওবন্দ তাঁর আপত্তিও বহাল রেখেছে। তৃতীয়ত, দেওবন্দের কাছে প্রেরিত সর্বশেষ রুজুনামার পরও তাঁর অনেক বিতর্কিত বক্তব্য পাওয়া গেছে। এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হি. মোতাবেক ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ইং তারিখে সা'আদ সাহেবের ব্যাপারে তাদের সর্বশেষ যে অবস্থান তুলে ধরেছে, তা সবিশেষ লক্ষণীয় : "এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। সেটা হলো, এই [মুসা (আ.)-এর] ঘটনার বিষয়ে তো মাওলানা সা'আদ সাহেবের রুজুকে সন্তোষজনক বলা যায়, কিন্তু তাঁর চিন্তাগত বিচ্যুতির ব্যাপারে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, সে আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ কয়েকবার রুজুর পরও কিছুদিন পর পর তাঁর এমন কিছু নতুন বয়ান আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে আগের সেই মুজতাহিদসুলভ আন্দাজ, ভুল প্রমাণ-পদ্ধতি এবং দাওয়াতের ব্যাপারে নিজের বিশেষ চিন্তার সাথে শরীয়তের বক্তব্যকে অন্যায়ভাবে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা বিদ্যমান। এই কারণে শুধু দারুল উলূমের দায়িত্বশীলগণই নন, বরং অন্য হক্কানী উলামায়ে কেরামদের মাঝেও মাওলানা সা'আদ সাহেবের 'সামগ্রিক চিন্তার' ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের অনাস্থা রয়েছে। মাওলানা সা'আদ সাহেবের

এই অনর্থক ইজতিহাদ দেখে মনে হয় যে আল্লাহ না করুন, তিনি এমন এক নতুন দল তৈরির দিকে চলছেন, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বিশেষ করে নিজেদের আকাবীরদের থেকে ভিন্ন রকমের হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আকাবীর ও পূর্বসূরিদের পথ ও পদ্ধতির ওপর অটল রাখুন। আমীন।

কাজেই মাওলানা সা'আদ সাহেবের প্রসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় হলো "

১. এ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে ইসলামে স্থানের 'ইতআত' করা নিষেধ। কোনো স্থান কখনোই অনুসরণীয় হতে পারে না। আর কোনো ব্যক্তি যখন হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তখন তার 'ইতাআত' কিছুতেই বৈধ নয়।

২. এ বিষয়টিও হৃদয়াঙ্গম করতে হবে যে হাদীসে পাকের বর্ণনা মতে, শেষ জমানায় দ্বীনের নামে বহু দল ও উপদল সৃষ্টি হবে। কোন দল হক আর কোন দল বাতিল, তা নির্ণয় করবেন প্রত্যেক যুগের দ্বীনি ইলমের ধারক হক্কানী উলামায়ে কেরাম। আর জনসাধারণের কাজ হলো, দ্বীনি সকল বিষয়ে উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের ওপরে পূর্ণ আস্থাশীল ও আত্মসমর্পিত হওয়া। (তিরমিযী শরীফ-২৬৪১, আত তামহীদ-১/৫৯, মুসনাদে আহমাদ-৩০৫৬) আর বর্তমানে আলোচিত দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টিও যেহেতু দ্বীনি বিষয়, উপরন্তু যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম এ দ্বীনি কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন, কাজেই আমাদের উচিত হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উলামায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করা।

৩. তৃতীয়ত, মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। কাজেই মাওলানা সা'আদ সাহেব ভুলের ঊর্ধ্বে নন এবং বর্তমানে যেহেতু পুরো দুনিয়ার উলামায়ে কেরাম তাঁর ভুল ধরেছেন, কাজেই বর্তমানে নেজামুদ্দিনের নামে তাঁর অনুসরণ করা নিষেধ। তাঁর অনুসরণ বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক :

ক. মাওলানা সা'আদ সাহেব সব ধরনের বিতর্কিত বক্তব্যের ব্যাপারে প্রকাশ্যে, স্পষ্ট শব্দে ভুল স্বীকারকরত বড় বড় মজমার মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা দেবেন এবং এ রুজুর ওপর তিনি অটল-অবিচল থাকবেন।

খ. তাবলীগের পূর্ববর্তী তিন হযরতজির 'নির্দেশিত পন্থায়' তাবলীগের কাজ করবেন এবং এ জন্য নেজামুদ্দিনের প্রবীণ মুরব্বিদেরকে নেজামুদ্দীনে ফিরিয়ে এনে তাঁদেরকে চোখের সামনে রেখে দেখে দেখে, তাঁদের পরামর্শমতো চলবেন।

গ. দারুল উলূম দেওবন্দসহ বিশ্বের হক্কানী উলামায়ে কেরামের জামাআত তাঁকে 'আস্থাভাজন' হিসেবে ঘোষণা দেবে। যত দিন পর্যন্ত তিনটি বিষয় না পাওয়া যাবে, তত দিন তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ হবে, একটি 'গোমরাহ দল' সৃষ্টিতে সহায়তা করা

৪. মাওলানা সা'আদ সাহেবের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের এ সুস্পষ্ট অবস্থানের পরও দাওয়াত ও তাবলীগের যে সকল সাথী নেজামুদ্দিনের ইতাআতের নামে মাওলানা সা'আদ সাহেবের ইতাআতের ওপর থাকবে, তাদের ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও তাদের মতাদর্শী সাথীদের (চরম পন্থায় না গিয়ে হিকমতের সাথে) দৃঢ় অবস্থানে যেতে হবে, যাতে তারা (নেজামুদ্দিনের অনুসারীরা) কোনো ধরনের ফেতনা সৃষ্টি করা কিংবা উলামাদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরির অবকাশ না পায়। কাজেই তাদের দাওয়াত ও তাবলীগের শিরোনামে কোনো ধরনের মশওয়ারা, গাশত, জোড় ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। বরং তাবলীগের এ কাজগুলো হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং তাঁদের মতদর্শী সাথীরা সা'আদ সাহেবের পূর্ববর্তী তিন হযরতজির 'নকশা' অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দেবেন।

৫. দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ উলামায়ে কেরামের কাজ, তাঁরাই এ কাজের পৃষ্ঠপোষক এবং মূল দায়িত্বশীল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতেও তাঁদেরকেই এ কাজের 'রাহবারের' ভূমিকা পালন করতে হবে। এ কারণে সকল মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন হলো, জামিআর এক বা একাধিক উস্তাদকে দরস-তাদরীসের ব্যস্ততা কম দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্য ফারেগ করে দেবেন। যেন তিনি জামিয়ার পক্ষ হতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এর দ্বারা মাদরাসার তা'লীম, তরবিয়্যাতসহ সকল লাইনে ফায়দা হবে, ইনশাআল্লাহ!

সর্বোপরি, সব সময়ের জন্য লক্ষ রাখতে হবে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাওলানা সা'আদ সাহেবের ইতাআত নিষেধ হলেও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বন্ধ করা যাবে না। বরং হক্কানী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে তা সর্বাবস্থাতেই চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো অলসতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহীহভাবে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআনের বাংলায়নে জটিলতা : সমাধান ও বিধি-বিধান

মাওলানা কাসেম শরীফ

আল কোরআন বিশ্বের বিস্ময়কর গ্রন্থ। এটি সর্বাধিক প্রশংসিত মহা প্রজ্ঞাময় রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতারিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

অর্থ : 'আলিফ-লাম-রা। এই কিতাবের আয়াতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (এটি) প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে অবতারিত হয়েছে।' (সূরা : হুদ, আয়াত : ১)

আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে অমর, অবিনশ্বর ও চিরন্তন অলৌকিকতায় পূর্ণ একমাত্র আল কোরআনই সর্বকালে মানুষকে কল্যাণের অফুরন্ত ধারায় সিক্ত করেছে। সত্যান্বেষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। চিন্তাশীলদের মধ্যে ব্যাপক চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়েছে। বিশ্বজনীন এ গ্রন্থের আবেদন সব যুগে ও সব স্থানেই কার্যকর রয়েছে। কোরআনের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়েই মুসলমানরা পৃথিবীকে একটি উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছে। এ সভ্যতা শত শত বছর ধরে বিশ্বে উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নত নৈতিক গুণাবলির আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর বিধি-বিধান মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো গ্রন্থগুলো ঐশী গ্রন্থ হলেও সেগুলো কেবল বিশেষ যুগের, বিশেষ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও চিন্তাগত অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। সেগুলো কেবল নির্দিষ্ট যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআনের উপযোগিতা কালোত্তীর্ণ এবং তা বিশেষ কোনো জাতি ও যুগের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কোরআনের বাণী সব যুগেই মানুষের জন্য সজীব, নতুন ও প্রাণবন্ত হয়ে বিরাজ করছে। কোরআনের বক্তব্য নতুন, দৃঢ়, ভিত্তিপূর্ণ, ব্যাপক ফলদায়ক ও নজিরবিহীন। কোরআনের চেয়ে উন্নত বক্তব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পবিত্র কোরআনের শব্দ ও বাক্যের ছন্দময়তা এবং হৃদয় কেড়ে নেওয়া ধ্বনি-মাধুর্য বা শ্রুতিমধুরতা মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে, আলোড়িত করে ও উদ্দীপ্ত করে। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সব যুগের জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা কোরআনের বিচিত্রময় তথ্যসম্ভার, ইতিহাস জ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর বাগ্মিতা, ভাষাশৈলী ও সাহিত্যমানকে অলৌকিক বলে উল্লেখ করেছেন। কুদরতী নিয়মে হাজারো বছর ধরে অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় এ গ্রন্থকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিখে রাখার পাশাপাশি হাজারো বছর ধরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে একে ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোরআনের লাখো হাফেজ বা মুখস্থকারী রয়েছেন। মানব ইতিহাসে আর কোনো গ্রন্থের এত হাফেজ নেই। কোরআনের আয়াত অন্তহীন জ্ঞানের ভাণ্ডার। এর প্রতিটি চরণ হিরকখণ্ডতুল্য। কোরআনের আগে বহু আসমানী ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সেসব গ্রন্থে ব্যাপকভাবে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিধানাবলি, কোনো কিছুই বিকৃতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। যখন থেকে আগের ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হয়, তখন থেকে সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। পরিবর্তনের পথ ধরে আগের আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে মানব রচিত জ্ঞান ও চিন্তাধারা স্থান করে নেয়। অন্যদিকে মানুষের জ্ঞান নির্ভুল নয়, অকাট্যও নয়। মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। তাই সেসব বিকৃত বর্ণনার সঙ্গে উন্নত গবেষণা ও নিখুঁত বিশ্লেষণের সংঘর্ষ দেখা দেয়। হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী, অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোরআন অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় আছে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিশ্বাস এবং উপাসনায় যেসব বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে, কোরআন সেগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের যতই উন্নতি হোক না কেন, কোরআনের বক্তব্য ও বিধানের ওপর সেগুলো কোনো প্রভাব ফেলে না। এর কারণ হলো, কোরআনের জ্ঞান সঠিক উৎস থেকে আহরিত হয়েছে এবং বিশেষ

ব্যবস্থায় তা সুরক্ষিত রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে কোরআনের বিরোধ নেই। কোরআন ও অন্য আসমানী গ্রন্থের মধ্যে এটি মৌলিক পার্থক্য।

এই কোরআন গোটা বিশ্ব মানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

অর্থ : 'কত বরকতপূর্ণ তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে গোটা বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।' (সূরা : ফুরকান, আয়াত : ১)

গোটা বিশ্বের সব মানুষের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হলেও বিশ্বের সব ভাষায় কোরআন নাজিল হয়নি। কোরআন নাজিল হয়েছে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায়। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)

অর্থ : 'নিশ্চয়ই এটি (কোরআন) গোটা বিশ্বের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পবিত্র আত্মা [জিবরিল (আ.)] এটি নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।' (সূরা : শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৫)

আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ :

বিশ্বে হাজারো ভাষা প্রচলিত আছে। আছে অগণিত জাতি। দেশ, কাল ও জাতির কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাষায় কোরআন নাযিল করা আল্লাহর পক্ষে কঠিন ছিল না। এর পরও কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর অনেক কারণ আছে। আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ ভাষায় ভাব প্রকাশের অসংখ্য উপায় আছে। প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে আরবী ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজনমাফিক ভাষাটি সহজেই শিখে নিতে পারে। তাই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম যখনই কোনো নতুন অঞ্চলে গিয়েছেন, সেখানকার মানুষ ইসলাম কবুলের সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ফলে দেখা যায়, মক্কা-মদীনার সীমানা ছাড়িয়ে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান, মৌরিতানিয়া, মিসর, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের জাতীয় ভাষা হয়ে ওঠে আরবী। অথচ এসবের কোনোটিতেই আরবী তাদের জাতীয় ভাষা ছিল না। আরবী বর্ণমালা সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : আরবী, ফিনিসিয়ান, হিব্রু, আরমায়িক, সুরিয়ানি প্রভৃতি বর্ণমালা মূল সামি বা সেমিটিক বর্ণমালা হতে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে গ্রিক, লাতিন, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সেই মূল সামি বর্ণমালা থেকে। কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ভারতের ব্রাহ্মলিপিও এই সামি বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৪)

এ বিষয়ে এ সি মুরহাউস 'রাইটিং অ্যান্ড দ্য অ্যালফাবেট' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'পৃথিবীতে বর্ণমালা আছে মাত্র একটি। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তা-ই ছড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করেও মূলে তা এক ও অভিন্ন। বিষয়টি চাক্ষুষ দেখানো যায়।'

পৃথিবীর ভাষাগুলো কত ভাগে বিভক্ত, তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা শিবলী নুমানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী ভাষা পরিবারকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন–

(ক) আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয়। বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসি, লাতিন, ইংরেজি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সেমিটিক। হিব্রু, আরমায়ী, আরবী ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) তুরানি বা মঙ্গোলিয়া। চৈনিক, জাপানি, তুর্কি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। (শিবলী নুমানী : মাকালাতে শিবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, আযমগড়, ১৯৫০ পৃ. ১)

ইসলামী গবেষকরা ছাড়াও পাশ্চাত্যের বহু ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে প্রধান ও মৌলিক ভাষা হলো সেমিটিক ভাষা। সেখান থেকেই আরবী ভাষার জন্ম। আরবী ভাষার মতো এত সমৃদ্ধশালী, মোহনীয়, সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই। এর প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, ভাবগাম্ভীর্য, নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা এ ভাষাকে পৃথিবীর অন্য সব ভাষা থেকে স্বতন্ত্র মহিমায় দেদীপ্যমান করে রেখেছে। সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে অন্যান্য ভাষার চেয়ে আরবী ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি।

সম্ভবত এমন বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোরআনের জন্য আরবী ভাষা চয়ন করা হয়েছে। আরবী ভাষা উচ্চারণের দিক দিয়ে অন্য ভাষার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। আরবী হরফ উচ্চারণের উৎপত্তিস্থল দুই ঠোঁট থেকে কণ্ঠনালির শেষ ভাগ পর্যন্ত। আরবী ছাড়া বিশ্বে অনেক অক্ষরবিশিষ্ট ভাষা আছে, যেগুলোর উচ্চারণের উৎপত্তিস্থল মুখের সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরবী বর্ণের উচ্চারণের মধ্যেও শব্দের অর্থের ব্যবধান আছে।

তাই কোরআন ও হাদীসের শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে না পারলে অর্থে তারতম্য ঘটে। ফলে পাঠক গোনাহগার হয়। আরবী বর্ণ উচ্চারণের উৎপত্তিস্থল ১৪০০ বছর ধরে আজও অবিচল আছে, যা অন্য কোনো ভাষায় দেখা যায় না।

শব্দাবলি ও সমার্থবোধক শব্দাবলির দিক থেকে আরবী অভিধান সবচেয়ে সমৃদ্ধ। কেননা আরবী হলো শব্দের ব্যুৎপত্তির ভাষা। যেমন–ফরাসি শব্দের সংখ্যা ২৫ হাজার, ইংরেজি শব্দের সংখ্যা এক লাখ আর আরবী মূল অক্ষর বা মাদ্দাহভিত্তিক শব্দের সংখ্যা চার লাখ। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে ৮০ হাজার মাদ্দাহভিত্তিক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে আরো অনেক শব্দ বের করা যায়।

আরবী শব্দ বিশেষ করে ক্রিয়া তিন বর্ণের কমে গঠিত হয় না। আবার একটা ক্রিয়া তিন থেকে ছয়টি বর্ণ দ্বারা গঠিত হতে পারে। তেমনি অক্ষর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মধ্যেও আধিক্যের প্রভাব বিস্তার করে।

আরবী ভাষার কোনো শব্দ উচ্চারণ কঠিন হলে প্রয়োজনে কোনো অক্ষর ফেলে দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজনে এক অক্ষর অন্য অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়।

সমার্থক শব্দের আধিক্য আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী ভাষা জীবন্ত থাকার পেছনে এটাও একটা কারণ যে মনের মাধুরী মিশিয়ে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন–আরবী অভিধানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লিসানুল আরবে'র তথ্য মতে, 'আসাল' শব্দের অর্থ মধু। আরবীতে এর সমার্থক শব্দ রয়েছে ৮০টি। 'সাইফ' শব্দের অর্থ তরবারি। আরবীতে এর সমার্থক শব্দ রয়েছে ১০টি।

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ড. জুরজি জাইদান লিখেছেন, প্রত্যেক ভাষার সমার্থক শব্দ আছে। কিন্তু আরব জাতি এ বিষয়ে সব জাতির চেয়ে এগিয়ে গেছে। আরবীতে 'সানাহ' শব্দের অর্থ বছর। এর জন্য ২৪টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। 'নূর' শব্দের অর্থ আলো। এর জন্য ২১টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। 'জলাম' শব্দের অর্থ অন্ধকার। এর জন্য ৫২টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। সূর্যের আরবী হলো 'শামস'। এর সমগোত্রীয় ২৯টি শব্দ রয়েছে। 'সাহাব' শব্দটি আরবী। এর অর্থ মেঘ। আরবীতে মেঘ বোঝাতে ৫০টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির আরবী 'মাত্বার'। বৃষ্টি বোঝাতে আরবীতে ৬৪টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। পানির জন্য ১৭০টি শব্দ, উটের জন্য ২৫৫টি শব্দ ও সিংহ বোঝাতে ৩৫০টি শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব। (তারিখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪৫)

কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করার কারণ হিসেবে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি যদি এই কোরআনকে অনারবী ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তারা বলত, এর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না কেন? এটা কেমন কথা যে কোরআন অনারবী ও রাসূল [মুহাম্মদ (সা.)] আরবীয়। বলো, যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য এটা হেদায়েত ও (আত্মার) ব্যাধির প্রতিকার, আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে বধিরতা আছে। তাদের জন্য এটা অন্ধত্বের কারণ। এরা এমন যে, যেন তাদের বহু দূর-দূরান্ত থেকে ডাকা হচ্ছে।' (সূরা : হা-মিম সিজ্‌দা, আয়াত : ৪৪)

এ আয়াতের মূল কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর ভাষা আরবী ছিল বলে কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক নবীকে তাঁর স্বজাতীয় ও স্বগোত্রীয় ভাষাভাষী করে পাঠানো আল্লাহর চিরাচরিত রীতি।

বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে কোরআন নাযিল হয়েছে :

কোরআন থেকে বিশ্বাসী ও খোদাভীরু লোকেরা সর্বাধিক উপকৃত হয়। কিন্তু কোরআন এসেছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য। ইরশাদ হয়েছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : 'রমজান এমন একটি মাস, যার মধ্যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে, যা (এ কোরআন) মানবজাতির জন্য হেদায়েতস্বরূপ, হেদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা.) গোটা বিশ্বের নবী। কিন্তু কোরআন শুধু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলে অন্য ভাষার লোকেরা কিভাবে কোরআন থেকে উপকৃত হবে? এর জবাব হলো, মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। আর সেখানকার ভাষা আরবী। তাই কেন্দ্রস্থলের ভাষা আরবীতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আরবী ভাষাভাষীরা সবার আগে তা বুঝতে পারে। আর অন্য ভাষাভাষীরা তাদের মাধ্যমে কোরআন বুঝতে পারে। এ

বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটা বরকতময় কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি। এটি আগের আসমানী কিতাবগুলোর সমর্থক, যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদগুলোর কেন্দ্র (মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারো। যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা এর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।' (সূরা : আন'আম, আয়াত : ৯২)

কোরআন আল্লাহর পাঠানো গ্রন্থ। মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতির পথনির্দেশ হিসেবে এ মহান কিতাব অবতরণ করেছেন। কোরআন আমার জন্য এসেছে। কোরআন আপনার জন্য এসেছে। কোরআন মুসলিমের জন্য এসেছে। কোরআন অমুসলিমের জন্য এসেছে। কোরআন পণ্ডিতদের জন্য এসেছে। কোরআন মূর্খদের জন্যও এসেছে। কোরআন দ্বীনদারদের জন্য এসেছে। কোরআন বেদ্বীনদারদের জন্যও এসেছে। কোরআন আলেমদের জন্য এসেছে। কোরআন গাইরেআলেমদের জন্যও এসেছে। কোরআন গোটা বিশ্বের রবের শেষ চিঠি। এরপর আর কোনো বার্তা নিয়ে আসমানী গ্রন্থ আসবে না। পৃথিবীর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এ মহান পুস্তক একমাত্র বার্তাবাহক।

কোরআনের বিশ্বায়নের রূপরেখা :

একদিকে কোরআন গোটা বিশ্বের সব মানুষের জন্য এসেছে। অন্যদিকে কোরআন গোটা বিশ্বের মানুষের ভাষায় নাযিল না হয়ে আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যকার দূরত্ব দূর করার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো ইসলামের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতি কার্যক্রম। দাওয়াতি কার্যক্রম কোরআনের মূল চেতনা। এর মাধ্যমেই কোরআনি শিক্ষার বিশ্বায়ন ঘটবে। মহানবী (সা.) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে এ কোরআন পৌঁছে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য হলো–

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থ : '...এই কোরআন আমার কাছে (ওহী মারফতে) প্রেরিত হয়েছে, যাতে আমি এর মাধ্যমে তোমাদের ও তাদের সতর্ক করি, যাদের কাছে তা পৌঁছবে...।' (সূরা : আনআম, আয়াত : ১৯)

কোরআনের শিক্ষা ও কোরআনের নবীর নির্দেশনা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি দল সব দেশে ও সব যুগে থাকা জরুরি। ইরশাদ হয়েছে :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ : 'আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪)

এই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। কোরআনের ভাষান্তর ও ভাবান্তর ছাড়া দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয়।

কোরআনের ভাষান্তরের দায়িত্ব কার? :

কোরআনের ভাষান্তর ও ভাবান্তরের মূল কাজটি আলেম-উলামা ও বিদগ্ধ ইসলামী পণ্ডিতদের। এর জন্য প্রথম শর্ত হলো ভাষাগত পাণ্ডিত্য। যদিও শুধু ভাষা জানলেই সর্বসাধারণের জন্য কোরআনের মর্মোদ্ধার ও পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে, '(আমি আগের নবীদের) প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলিসহ। আর আমি তোমার ওপর কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা তাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৪৪)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ব্যাখ্যা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কোরআন বোঝা সম্ভব নয়। এমনকি ভাষাগত জ্ঞান থাকলেও তা সম্ভব নয়। কেননা মক্কার লোকেরাও আরবী ভাষা বুঝত। কিন্তু তাদের কাছে কোরআন ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে এসেছে, 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদের পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪)

এ আয়াতে মহানবী (সা.)-এর প্রধান চারটি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এক. তিনি কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। দুই. তিনি উম্মতের আত্মশোধন করেন। তিন. তিনি কিতাব তথা কোরআনের ব্যাখ্যা দেবেন। চার. তিনি হিকমত শিক্ষা দেন। এ আয়াত থেকেও জানা যায়, সর্বসাধারণের জন্য ব্যাখ্যা ছাড়া

কোরআন বোঝা সম্ভব নয়, যদিও তারা আরবী ভাষাগত জ্ঞান লাভ করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পড়াশোনায় কোরআনের মর্মপোলব্ধি সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কথা আরবী ভাষাভাষী বা অনারবী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) লিখেছেন, 'সঠিকভাবে কোরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বোঝার জন্য ১৫ ধরনের জ্ঞানে পারদর্শী হতে হয়। যথা–ইলমে ছারফ (আরবী শব্দপ্রণালী)। ইলমে ইশতিকাক (আরবী শব্দের ধাতুগত ও অর্থগত ব্যবহার)। ইলমুন নাহু (আরবী বাক্যপ্রণালী)। ইলমুল বায়ান (আরবী বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং তুলনা ও ইশারা)। ইলমে বাদী (আরবী বাক্যের সৌন্দর্যপ্রণালী)। ইলমে মা'আনী (বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সময়ের চাহিদাবিষয়ক জ্ঞান)। ইলমে আকায়েদ (ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের জ্ঞান)

ইলমুল কিরাআত (বিভিন্ন কেরাতের শব্দ ও অর্থগত তারতম্য)। ইলমু উসূলিদ্দীন (ইসলামের মূলনীতি)। ইলমু উসূলিল ফিকহ (ইসলামী আইনের মূলনীতি)। আসবাবে নুজুল (কোরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট)। কাসাস বা ঘটনাবলি। নাসেখ ও মানসূখ (রহিতকারী ও রহিত আয়াতের জ্ঞান)। ইলমে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র)। ইলমুল হাদীস (হাদীসশাস্ত্র)। ইলমে লাদুনী (আল্লাহপ্রদত্ত ইলম)। এসব জ্ঞান কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের জন্য অপরিহার্য। এসব জ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন ছাড়া কেউ কোরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করলে তা হবে 'তাফসীর বির রায়' তথা মনগড়া ও বিভ্রান্তিমূলক তাফসীর। (রূহুল মা'আনী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬-৭)

আধুনিক যুগে 'উলুমূল কোরআন' বিষয়ে বহুল পঠিত গ্রন্থ হলো 'মাবাহেস ফী উলূমিল কোরআন'। এটি লিখেছেন ড. মান্নাউল কাত্তান। তাঁর মতে, কোরআনের তাফসীরের জন্য তাফসীরকারকের মধ্যে সাতটি গুণ থাকা অপরিহার্য। (১) বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া। (২) কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোরআনের অনুবাদ বা তাফসীর না করা। (৩) প্রথমে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য আয়াতের সাহায্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করা। (৪) কোরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের বক্তব্য খোঁজ করা এবং হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা। (৫) কোরআন ও হাদীস থেকে কোরআনের কোনো শব্দের বা আয়াতের মর্ম উদ্‌ঘাটনে সক্ষম না হলে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। (৬) কোরআনের কোনো শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য আয়াত, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হলে তাবেঈদের বর্ণনা গ্রহণ করা। (৭) আরবী ভাষা ও এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল হওয়া। (মান্নাউল কাত্তান, মাবাহেস ফী উলূমিল কোরআন, মাকতাবাতু ওহাবা, কায়রো, মিসর, পৃষ্ঠা : ৩২১-৩২২)

সর্বসাধারণের কোরআন বোঝার চেষ্টা : পরিধি ও পদ্ধতি

কোরআন বোঝা ও কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা শুধু কি আলেমদের দায়িত্ব? আসলে কোরআন মোতাবেক আমল করা ও জীবন পরিচালনা করা সব ঈমানদারের জন্য জরুরি। এ জন্য প্রয়োজনীয় সূরা শিখে নেওয়া ও প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান জেনে নেওয়া সব মুসলমানের জন্য ফরয। তবে পুরো কোরআন বোঝা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোরআনের তাফসীর চার ভাগে বিভক্ত।

এক. আরবরা বা আরবী ভাষাবিদরা ভাষার মাধ্যমেই জানে।

দুই. কোরআনের কিছু অংশ না জানা ও না বোঝার অজুহাত কারো পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

তিন. কিছু আয়াতের তাফসীর অনুধাবন শুধু আলেমদের পক্ষেই সম্ভব।

চার. কোরআনের কিছু অংশের অর্থ ও তাফসীর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। (তাফসীরে ইবনে জারির : ১/৫৭)

এ প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.) সূরা নিসার (৪) ৮২ নম্বর আয়াতের আলোচনায় লেখেন, 'প্রতিটি মানুষ কোরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক–এটিই কোরআনের দাবি। সুতরাং এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে কোরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদের (বড় বড় আলেমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ের মতোই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও ভালোবাসা এবং

আখেরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সব সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলেমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেয়, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নেবে। (মা'আরিফুল কোরআন ২/৪৮৮)

তবে সবার আগে বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা শিখতে হবে। বিশুদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য কিছু সূরা মুখস্থ করার বিকল্প নেই। ফরয আমলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ফরয।

কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই কোনো আলেমের কাছে অল্প অল্প করে কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করুন। যুগে যুগে যারা কোরআনের ভাষান্তর করেছেন, তাঁরা কোরআন পাঠের পদ্ধতিও বলে দিয়ে গেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর পুত্র হযরত শাহ আবদুল কাদের দেহলভী (রহ.) 'মূযিহুল কোরআন' নামে উর্দু ভাষায় কোরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। ভূমিকায় তিনিও বলেছেন, 'লক্ষ করুন, মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য রবের পরিচয় লাভ করা, তাঁর গুণাবলি জানা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জ্ঞান অর্জন করা। কারণ এটা ছাড়া বন্দেগি হতে পারে না। আর যে বন্দেগি করে না, সে বান্দা নয়। আর মানুষ আল্লাহর পরিচয় পাবে (শিক্ষকের) শেখানোর দ্বারা। কারণ মানব-সন্তান সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মলাভ করে, এরপর শেখানোর দ্বারা সব কিছু শিখে ফেলে। আর যদিও (উর্দু তরজমার দ্বারা) কোরআনের অর্থ বোঝা সহজ হয়েছে, তবু উস্তাদের সনদ প্রয়োজন। কেননা প্রথমত, সনদ ছাড়া কোরআনের মর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বাপর মিলিয়ে সঠিক অর্থ বোঝা এবং ভুল ও বিচ্ছিন্ন অর্থ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা উস্তাদের সহায়তা ছাড়া হয় না। কোরআনের ভাষা আরবী হওয়ার পরও আরবদের শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছে।'

একই কথা বিস্তারিতভাবে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহ.) তাঁর অনূদিত তরজমায়ে কোরআনের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

অনেক আলেম সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত অধ্যয়নে মাতৃভাষায় কোরআন চর্চায় অনুৎসাহী করে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ্য এই নয় যে সাধারণ মানুষ কোরআন শিখে ফেললে আলেমদের চেয়ে জ্ঞানীয় হয়ে যাবেন। ফলে তাঁরা আলেমদের কাছে আসবেন না। বরং সেসব আলেম ভয় করেন যে এতে করে যেন কেউ ভ্রষ্টতার শিকার না হয়। কেননা সত্যিকার কথা হলো, পরিপূর্ণভাবে অন্য ভাষায় কোরআনের ভাবান্তর, ভাষান্তর ও মর্মোদ্ধার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই নবীদের উত্তরাধিকার আলেমসমাজকে এ ভয় তাড়িত করে যে সাধারণ মানুষ যেন কোরআন পড়ে এর মর্মোদ্ধার করতে না পেরে বিভ্রান্ত না হয়। কেননা কোরআন পাঠ করে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার হুঁশিয়ারি খোদ কোরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

অর্থ : '...এর মাধ্যমে তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন...।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৬)

তাই অনেক আলেম সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত অধ্যয়নে মাতৃভাষায় কোরআন চর্চায় অনুৎসাহী করে থাকেন।

অনুবাদ বা শব্দ শিখে কোরআন বোঝা যায় না :

সাহাবায়ে কেরামের ভাষা ছিল আরবী। তথাপি তাঁরা শব্দার্থ জেনে বহু ক্ষেত্রে কোরআনের মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। বহু আয়াত বা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা মহানবী (সা.)-এর দ্বারস্থ হয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

(এক) এক আয়াতে এসেছে :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ : 'যারা ঈমান এনেছে ও তাদের ঈমানকে জুলুমের মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা। আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।' (সূরা : আন'আম, আয়াত : ৮২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন সাহাবীদের কাছে বিষয়টা কঠিন মনে হয়েছে। তাঁরা জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে তার নিজের ওপর কোনো 'জুলুম' করেনি? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত

অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' শব্দ ব্যবহার করে শিরক বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য আয়াতে এসেছে :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই শিরক হলো বড় জুলুম।' (সূরা : লোকমান, আয়াত : ১৩)

কাজেই ওই আয়াতের অর্থ হলো, যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণাবলি ও ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না, তারা শান্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথপ্রাপ্ত। (সহীহ বোখারী, হাদীস : ৩১১০)

(দুই) মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থ : 'আর তোমরা আহার করো ও পান করো, যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট না হয়।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর আদি ইবনে হাতেম (রা.) একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা নিয়ে বালিশের নিচে রাখেন। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিনি সে দুটি সুতা বারবার দেখতে থাকেন। কিন্তু কালো ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়ল না। সকাল হলে তিনি বলেন,

قَالَ :أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِينَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادِي عِقَالَيْنِ، قَالَ : إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ

অর্থ : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কালো ও সাদা দুটি সুতা আমার বালিশের নিচে রেখেছিলাম (তারপর সব ঘটনা বলেন।' রাসূল (সা.) বলেন, 'তাহলে তো দেখছি তোমার বালিশ বেজায় চওড়া! আসলে এ দুটি সুতা নয়, বরং রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।' (বোখারী, হাদীস : ১৯১৬)

এ দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শুধু শব্দ শিখে কোরআনের অনুবাদ করা যায় না। কোরআন বোঝাও সুকঠিন।

কোরআনের বাংলায়নের কয়েকটি পর্যায় :

শিরোনামে আমরা অনুবাদ, ভাষান্তর, ভাবান্তর, ভাবানুবাদ, বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি শব্দ পরিহার করে 'বাংলায়ন' শব্দ ব্যবহার করেছি। এর কারণ হলো, আমরা মনে করি, এ শব্দটি অন্য শব্দের চেয়ে ব্যাপক অর্থবাহী, যা আমাদের আলোচনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কোরআনের বাংলায়নের কয়েকটি পর্যায় ও পদ্ধতি রয়েছে। এক. বাংলা উচ্চারণে কোরআনের হরফ লিপিবদ্ধ করা। দুই. কোরআনের হুবহু শাব্দিক অনুবাদ করা। তিন. কোরআনের পারিভাষিক শব্দগুলো সস্থানে বহাল রেখে অপারিভাষিক শব্দের ভাষান্তর করা। চার. মূল আরবী সংযুক্ত না করে কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করা। পাঁচ. বাংলা ভাষায় কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা।

বাংলা উচ্চারণে কোরআন লেখা ও পড়া হারাম :

আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কোরআনের সঠিক উচ্চারণ অসম্ভব। তাই কোরআন শরীফকে অন্য ভাষায় লেখা বা পড়া সব যুগের ও সব দেশের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে নাজায়েয। এতে কোরআনের শব্দ ও অর্থ বিকৃত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে কোরআন শিখে নিতে হবে। (আল ইতক্বান : ৮৩০-৮৩১, ইমদাদুল আহকাম : ১/২৪০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১/৪৩, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ২/৯৫)। এমনকি আরবী ভাষা ঠিক রেখেও কোরআন শরীফের বিশেষ রসমুল খত তথা লেখারীতির বিপরীত লেখাও ইমামদের ভাষ্যমতে নিষিদ্ধ। (ফাজায়েলুল কোরআন, ইবনে কাসির : ৫০, আল ইতক্বান : ৮৩০-৮৩১, আননুসুসুল জালিয়্যাহ : ২৫)

বাংলা বা যেকোনো অনারবী ভাষায় কোরআনের উচ্চারণ লেখার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো, এর দ্বারা মানুষ সঠিকভাবে কোরআন না শিখে শুধু উচ্চারণনির্ভর ভুল কোরআন পাঠে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। অথচ প্রত্যেক নর-নারীর ওপর কোরআন এতটুকু সহীহ-শুদ্ধ করে পড়া ফরযে আইন, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয় না। অর্থ পরিবর্তন হয়–এমন ভুল পড়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। অতএব কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যে সূরাগুলো প্রয়োজন, সেগুলোকে শুদ্ধভাবে শিখে নেওয়া আবশ্যক, অন্যথায় সে গোনাহগার হবে। আর পূর্ণ কোরআন শুদ্ধভাবে শেখা সবার ওপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকায় পূর্ণ কোরআন শুদ্ধভাবে পাঠকারী একটি দল থাকা আবশ্যক। (মুকাদ্দামায়ে জাযারিয়া : ১১, মা'আরেফুল কোরআন : ৪/৪৮৯)

সাধারণ মানুষের কোরআন শেখার এই ধরনের পদ্ধতিকে কেন হারাম ঘোষণা করা হয়েছে? এর কারণ হলো,

আসলে এক ভাষার মাধ্যমে অন্য ভাষার অনুবাদ হয় না। ভাবের অনুবাদ হয়। এক ভাষার বর্ণমালার উচ্চারণ আরেক ভাষার বর্ণমালায় সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি ভাষার স্বতন্ত্র বর্ণমালা আছে, যেগুলো সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যে অন্য ভাষার চেয়ে আলাদা। ইংরেজি (V) ভি-র উচ্চারণ আরবীতে ও বাংলায় সম্ভব? কস্মিনকালেও সম্ভবপর না। আরবী ض-এর উচ্চারণ পৃথিবীর কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। আরবী ق ك 'কাফ' 'কাফ' হরফের উচ্চারণ দুই জায়গা থেকে হয়। ح،ه 'হা', 'হা' উচ্চারণও দুইভাবে হয়। আরবী প্রতিটি হরফের জন্যই আলাদা মাখরাজ বা উচ্চারণের বিশেষ স্থান আছে। এর সামান্য বেশকম হলে কোরআনের শব্দের অর্থের বিরাট ব্যবধান হয়ে যাবে। তখন সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহও হয়ে যেতে পারে। যেমন–'আউজু' (اعـــوذ)। এখানে 'আলিফ', 'আইন', 'ওয়াও' ও 'জাল'(أ ع و ذ)–এই চারটি অক্ষর আছে। এখানে আইন (ع) অক্ষরটি সঠিক স্থান থেকে উচ্চারিত না হলে তা হবে হামজার (ء) উচ্চারণে। ফলে হামজা (ء) অক্ষর দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যে 'আউজু' (ائـــوذ) শব্দ গঠিত হবে তার অর্থ হবে, আমি কষ্ট চাই। অথচ আউজু বিল্লাহি... (ائـوذ بـاللـه) এর সঠিক উচ্চারিত শব্দটির অর্থ হলো, আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে।

কোরআনের সূচনা হয়েছে 'আল-হামদু' (الـحـمـد) শব্দের মাধ্যমে। এখানে যে 'হা' (ح) আছে, সেটি 'জিম' (ج) হরফের পরের 'হা' (ح) হরফ। এর অর্থ হবে 'সব প্রশংসা'। কিন্তু আরবীতে আরো একটি 'হা' (ه) হরফ আছে, সেটি হামজার পরের 'হা'। এখন এ 'হা' (ه) হরফ দিয়ে যদি 'হামদু' (هـمـد) শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে মৃত্যু ও আগুনের তাপ। তাই এ 'হা' (ه) হরফ দিয়ে যদি কেউ 'আলহামদু' (الهـمـد)পড়ে, তাহলে বিকৃত অর্থ হয়ে যাবে।

কোরআনের একটি শব্দ 'আলিম' (عـلـيـم)। যার শুরুতে রয়েছে 'আইন' (ع) হরফ, যা 'গাইন' (غ) হরফের আগের হরফ। এর অর্থ হলো অতিশয় জ্ঞানী। তাই 'আল্লাহু আলীমুন'(الـلـه عـلـيـم)-এর অর্থ হবে আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী। কিন্তু একই উচচারণে 'আলিম'রূপে পৃথক একটি শব্দ আছে, যার শুরুতে হামজা (أ) হরফ রয়েছে। এর অর্থ হলো কঠিন পীড়াদায়ক। যেমন–'আজাবুন আলিম' (عـــذاب أليم) অর্থ কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি।

কোরআনে ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো 'কলম'(قـلـم)। এর অর্থ কলম বা লেখার উপকরণ। কিন্তু এ শব্দে যদি হরকত (যবর-যের-পেশ) দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে 'কালাম' (كـــلام)। অথচ আরবীতে 'কালাম' পৃথক একটি শব্দ। এর অর্থ কথা।

যাঁরা বাংলা উচ্চারণে কোরআনের হরফ লিখেছেন, তাঁদের লেখায় দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দের শেষে থাকা আরবী 'গোল তা' (ـــة) -কে ফেলে দিয়েছেন। যেমন–'তাওবাহ' (تـــوبة) থেকে 'তাওবা', 'রাহীনাহ' থেকে 'রাহীনা'। এটাও এক ধরনের শব্দের বিকৃতি।

'কালিমাতুন' (كـــلـــمة) শব্দটি কোরআনে অনেক জায়গায় এসেছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে এ শব্দকে লেখা হয় 'কালিমা'। আরবীতে শব্দটির অর্থ হলো কথা, বাণী ও তাওহীদের কালেমা। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'কালিমা' অর্থ মলিনতা, কালির দাগ ও কলঙ্ক।

বাংলা উচ্চারণে এ ধরনের জটিলতা থাকায় বিজ্ঞ আলেমরা বাংলা উচ্চারণসমৃদ্ধ কোরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণেই কোরআন পড়া জরুরি। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

এ ব্যাপারে বিশ্বের বড় আলেমরাও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন : ইবনে ফারেস, কাজি আয়াজ, ইবনে আরবী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), শেখ মোহাম্মদ আবদুল আজিম আল জুরকানি (আল-আজহার, মিসর), শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ দরাজ (মিসর), মুফতি মোহাম্মদ শফি (রহ.), শেখ তাহের আহমদ জাভি (লিবিয়া), শেখ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম আল আনসারী (দোহা, কাতার), মুফতি মাহমুদ হাসান গংগুহী (ভারত), শেখ আবদুল হামিদ তাহমাজ (রিয়াদ) ও ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান (রহ.) (বাংলাদেশ) প্রমুখ আলেমরা বলেছেন, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় আরবী হরফের সঠিক উচ্চারণ হয় না। তাই অন্য কোনো ভাষায় উচ্চারণ করে কোরআন পড়লে তা হবে ভুল। (ড. হাফেজ এ বি এম হিজবুল্লাহ, উজুবু কিতাবিল মাসহাফিস-শারীফ বিল-হরূফিল আরাবিয়া মা'আল ইলতিজামি বিররুসমিল উসমানী, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৩)

কোরআনের হুবহু শাব্দিক অনুবাদ কারো পক্ষে সম্ভব নয় :

কোরআন অলৌকিক গ্রন্থ। এর শব্দ, বাক্য, বিন্যাস ও রচনাশৈলী অলৌকিক। কোনো মানুষের পক্ষে কোরআনের হুবহু শাব্দিক অনুবাদ সম্ভব নয়। এখানে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি, পৃথিবীর কোনো ভাষায় এ আয়াতগুলোর হুবহু অনুবাদ সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

এ আয়াতের তিনটি অনুবাদ দেখুন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন লিখেছে, 'যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করো তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে...।' (আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ৪৯তম সংস্করণ, ২০১৩, সূরা আনফাল, আয়াত : ৫৮, পৃষ্ঠা ২৭৫)

লন্ডন থেকে প্রকাশিত আল কোরআন একাডেমি লিখেছে, 'যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আশংকা হয়, তাহলে (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি তুমি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুড়ে দাও...।' (হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, কোরআন শরীফ সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ, আল কোরআন একাডেমি, লন্ডন, তারিখবিহীন, পৃষ্ঠা ২০১)

গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'এবং যদি কোনো দলের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভয় করো; তবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে ফিরাইয়া দেও...।' ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান, কোরান শরিফ আদি বাংলা অনুবাদ গিরিশচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় প্রকাশ, মে, ২০১৪, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২১০)

এ তিনটি অনুবাদে অর্থের ভিন্নতা স্পষ্ট।

এর পরের আয়াত দেখুন :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

এ আয়াতে কর্তা বোঝাতে পাঁচবার 'আমি/আমরা' ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আরবীয় রীতি অনুযায়ী করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় একবাক্যে পাঁচবার কর্তা ব্যবহার করে একই ক্রিয়া উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তৃতীয় আয়াতটিও প্রণিধানযোগ্য। সব অনুবাদ গ্রন্থেই এ আয়াতের ভাবার্থ করা হয়েছে, হুবহু শাব্দিক অর্থ করা সম্ভব না হওয়ার কারণে।

এ ছাড়া বহু কারণে কোরআনের হুবহু অনুবাদ করা অসম্ভব।

এক. কোরআনের বহু স্থানে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর ভাষান্তর কোনো ভাষাতেই সম্ভব নয়। পরিভাষাকে এক শব্দে ভাবান্তর করা যায় না। যেমন–আল্লাহ শব্দের কোনো ভাষান্তর হয় না। ঈশ্বর, গড ও স্রষ্টা কিছুতেই আল্লাহ শব্দের অর্থ হতে পারে না। পরিভাষায়, আল্লাহ ওই সত্তা, যিনি স্বয়ম্ভূ, সদা বিরাজমান, যিনি পরিপূর্ণতা নির্দেশক সব গুণাবলির আধার। 'রব' শব্দের অর্থ কিছুতেই 'প্রতিপালক' ও 'পালনকর্তা' শব্দদ্বয় দিয়ে আদায় হয় না। 'রব' তিনিই, যিনি সব উপকরণ ব্যবস্থা করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিণতিতে পৌঁছে দেন। একইভাবে 'ঈমান' শব্দের আবেদন 'বিশ্বাস' দিয়ে ফুটে ওঠে না।

দুই. কোরআনের বহু স্থানে অতীতসূচক শব্দ ব্যবহার করে ভবিষ্যৎসূচক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কোথাও ভবিষ্যতের কোনো কিছুর অকাট্যতা বোঝাতে অতীতসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হুবহু অনুবাদ করা হলে এসব জায়গায় অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে।

তিন. আরবী ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ ভাষায় লেখার ফাঁকে ফাঁকে শব্দ মাহযূফ বা উহ্য রাখা যায়। অথচ লেখা না হলেও অনিবার্যভাবে উল্লেখ আছে বলে ধরে নিতে হয়। উহ্য শব্দের উপস্থিতি ধরা না হলে বাক্যের অর্থই বিকৃত হয়ে যায়। আরবীয় এ ধরনের ভাষারীতি কোরআনে বহু জায়গায় আনা হয়েছে। সেসব স্থানে হুবহু অনুবাদ সম্ভব নয়। সূরা বনি ইসরাঈলের একটি আয়াতাংশ দেখুন :

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'তাদের বংশধর, নূহের সঙ্গে আমি যাদের আরোহন করিয়েছিলাম।' শাব্দিক অনুবাদ অনুসারে এ বাক্য অর্থপূর্ণ নয়। এই পাঁচ শব্দের বাক্যে আরো দুটি শব্দ উহ্য আছে। সেগুলো যুক্ত করলে আয়াতের অর্থ এমন হবে, 'হে তাদের বংশধর! নূহের সঙ্গে আমি যাদের নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম।' (আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ৪৯তম সংস্করণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪৩৬)

আল কোরআনে এ ধরনের ব্যবহার হরহামেশাই দেখা যায়। সুতরাং কোরআনের হুবহু শাব্দিক অনুবাদ সম্ভব নয়।

চার. হুবহু শাব্দিক অনুবাদের জন্য আরবী ভাষার অভিধানের দ্বারস্থ হতে

হয়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক আরবীর মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। আগে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত আরবী বহু শব্দ এখন অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–কোরআনে এক স্থানে 'সাইয়্যারা' শব্দ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ

এর অর্থ হলো, 'আর একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল...।' কোরআনে শব্দটি কাফেলা বা দল অর্থে এসেছে। কিন্তু আধুনিক আরবীতে 'সাইয়্যারা' মানে গাড়ি।

পবিত্র কোরআনে অসংখ্য স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'আইনুন' (عيـــــن) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও চোখ অর্থে, কোথাও পানির প্রবাহ অর্থে, কোথাও ঝরনা অর্থে এ শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ শব্দটি গোয়েন্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ইকামা' (اقامة) শব্দটি কোরআনে কায়েম করা, অবস্থান করা ও প্রতিষ্ঠা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে এ শব্দ 'প্রবাসীদের অভিবাসনের অনুমতিপত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এসব শব্দের ক্ষেত্রে হুবহু অর্থ গ্রহণ সুকঠিন।

পাঁচ. কোরআনের বহু আয়াতে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব উপমার শব্দগত অর্থ কিছুতেই গ্রহণীয় নয়। যেমন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

শাব্দিক অর্থ : 'নারীরা তোমাদের (পুরুষের) জন্য পোশাক। আর তোমরা নারীদের জন্য পোশাক।' এ অর্থ বাস্তবতাবিবর্জিত। কিন্তু এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো, 'নারীরা তোমাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক, আর তোমরা নারীদের জন্য প্রশান্তিদায়ক।' (ইবনে কাসির)

সুতরাং কোরআনের হুবহু শব্দের অনুবাদ করা হলে কোরআনের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেবে।

পারিভাষিক শব্দগুলো সস্থানে রেখে কোরআনের ভাষান্তর :

পারিভাষিক শব্দগুলো সস্থানে রেখে কোরআনের ভাবান্তর ও ভাষান্তর বৈধ। গোটা বিশ্বের শতাধিক ভাষায় কোরআন অনূদিত হয়েছে। তবে সেগুলোকে অবশ্যই কোরআনের সরল অনুবাদ, ভাবানুবাদ ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করে লিখতে ও বলতে হবে। অর্থাৎ (নাউজুবিল্লাহ) 'বাংলা কোরআন', 'ইংরেজি কোরআন' ইত্যাদি বলা যাবে না। (মুহিউদ্দীন খান, সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মূল : মুফতি শফি (রহ.), পৃষ্ঠা ৯৮৫)

মূল আরবী সংযুক্ত না করে কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করা হারাম :

কোরআন শরীফের মূল আরবী সংযুক্ত না করে শুধু অনুবাদ লেখা, ছাপানো বা প্রচার করা মুফতিদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও অবৈধ। এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবসহ সব মাযহাবের ইমামদের ঐকমত্য রয়েছে। (জাওয়াহিরুল ফিকহ : ২/১০৪)

এর কারণ হলো, মূল আরবী ছাড়া অনুবাদ প্রচারের দ্বারা অনেক ধরনের ফিতনা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো–

এক. যেহেতু কোরআন শরীফের শব্দ ও মর্ম উভয়টিই মুজেজা বা ঐশী ও অলৌকিক। তাই এর মূল আরবীর অলৌকিক পাঠ বাদ দিয়ে মানুষের কৃত শুধু অনুবাদকে কোরআন বলে প্রচার করা জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

'নিশ্চয়ই আমি আরবী কোরআন নাযিল করেছি।' (সূরা ইউসুফ আয়াত : ২)

মানুষের কৃত শুধু অনুবাদ কখনো অলৌকিক পাঠ ও তার সমকক্ষ হতে পারে না। হুবহু শুদ্ধ অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনুবাদকের ভিন্নতায় অনুবাদও সামান্য ভিন্ন হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে যেকোনো একটিকে কোরআন বলা অন্যটিকে অস্বীকারের শামিল। অতএব অনুবাদের আগে যদি মূল আরবী সংযুক্ত থাকে, তাহলে এ সমস্যাটি থাকে না।

দুই. এতে কোরআন শরীফের মর্মে ধীরে ধীরে বিকৃতি আসার প্রবল আশঙ্কা। অথচ কোরআন শরীফের শব্দ, অর্থ ও ব্যাখ্যা সব কিছুর সঠিক সংরক্ষণ উম্মতের সবার ওপর জরুরি। তাই মূল আরবী সঙ্গে থাকলে তা শুধরিয়ে নেওয়া যাবে, যা শুধু অনুবাদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

তিন. অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি সাধনের এ-ও একটি কারণ যে তারা মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু মর্ম প্রচার করত, এতে ধীরে বহুলাংশে বিকৃতি সাধিত হয়।

চার. কখনো কখনো অনেক মানুষ এর দ্বারা কোরআন শরীফের মূল পাঠ শিখতে অনাগ্রহী হবে। অথচ কোরআনের মূল পাঠ শিক্ষা করাও ফরয। অধিক হারে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ইবাদত।

পাঁচ. ইসলামবিদ্বেষী ও

কোরআনবিরোধী চক্র এর দ্বারা ফায়দা লুটবে। নিজেদের মনগড়া অনুবাদ করে বাজারে ছাড়বে এবং এর দ্বারা জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে। অথচ মূল পাঠ সঙ্গে থাকলে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াতে পারবে না। (দেখুন : জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/১০৫-১২৭)

এ জন্যই যুগে যুগে আলেমরা তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হানাফী মাযহাবের বিদগ্ধ ফকীহ ইমাম বুরহানুদ্দিন মুরগিনানি, ইবনুল হুমাম, জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমি, আলাউদ্দিন হাসকাফি, শুরুনবুলালি, ইবনে আবেদিন শামি, আশরাফ আলী থানভী, মুফতি শফি; শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা জারকাশি, ইবনে হজর আসকালানি, হাফেজ সাখাবি; হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা ইবনে কুদামা রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : ফাতহুল কাদির ১/২৮৬, আলকিফায়া ১/২৪৯, আলমুগনি ১/৫৩০, আন্নাফহাতুল কুদসিয়া পৃঃ ৩৫, রদ্দুল মুহতার ১/৪৫৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/১০৩-১২৯)। এমনকি আল্লামা শুরুনবুলালি (রহ.) এ বিষয়ে 'আন্নাফহাতুল কুদসিয়া' নামক স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করে এর অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

আরবী সংযুক্ত করা ছাড়া কোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম। কেননা তা লেখা ও ছাপানো অবৈধ। তাই অবৈধ কাজের সহযোগিতা বিধায় এরূপ অনুবাদ গ্রন্থ ক্রয়-বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। কেননা এতে অবৈধ কাজের সহযোগিতা হয়ে থাকে। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/১০৪)

বর্তমানে বাংলাদেশে মূল আরবী সংযুক্ত না করে কোরআনের অনুবাদ প্রকাশের প্রবণতা বাড়ছে। সর্বপ্রথম এ কাজ করেছেন গিরিশচন্দ্র সেন। হয়তো তিনি বিষয়টি জানতেন না। কিন্তু পরে বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননানের সম্পাদনায় 'কোরান শরিফ আদি বাংলা অনুবাদ গিরিশচন্দ্র সেন' নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও মূল আরবী সংযুক্ত করা হয়নি। এরপর ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স থেকে প্রকাশিত (১৯২২-১৯২৫), খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ অনূদিত 'কোরানের বঙ্গানুবাদ' ছাপা হয়। সেখানে নাকি অমুসলিমদের পড়ার সুবিধার্থে আরবী বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৪ সালে হরফ প্রকাশনী থেকে মোবারক করীম জরহর অনূদিত কোরআন শরীফেও আরবী উল্লেখ করা হয়নি। ২০০০ সালে মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত ও বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত 'কোরআন শরিফে'ও মূল আরবী আনা হয়নি। ২০১৪ সালে যোগ ফাউন্ডেশন তথা কোয়ান্টাম মেথড থেকে 'আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী' নামে একটি অনূদিত কোরআন ছাপা হয়েছে। এ সমস্যা ছাড়াও এতে কোরআনের বহু আয়াত বিকৃত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অর্থ লেখা হয়েছে।

লায়ভা পাবলিশার্স, কারওয়ান বাজার, ঢাকা থেকে সন-তারিখ ছাড়া অনুবাদ পরিষদ কর্তৃক 'আল কুরআনুল হাকীম সরল অর্থানুবাদ' নামে একটি অনূদিত কোরআন ছাপা হয়েছে। এখানেও মূল আরবী সংযুক্ত করা হয়নি। গোটা বিশ্বের আলেমদের সর্বসম্মত ফতোয়া অনুযায়ী, এই অনূদিত কোরআনগুলো বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করা সময়ের দাবি। অথবা কর্তৃপক্ষকে মূল আরবী সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া যায়।

তবে কোরআনের দুই-এক আয়াতের অনুবাদ মূল আরবী সংযুক্ত না করে উল্লেখ করার অনুমতি আছে। উদ্ধৃতি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দু-একটি আয়াতের আরবী ছাড়া শুধু অনুবাদ লেখা বৈধ। যেহেতু এ পরিমাণের কারণে উল্লিখিত ক্ষতিগুলোর আশঙ্কা নেই। তবে পূর্ণ কোরআন বা উল্লেখযোগ্য বিরাট অংশের শুধু অনুবাদ লেখা অবৈধ। (ফাতহুল কাদির : ১/২৮৬, রদ্দুল মুহতার : ১/৪৫৩)

বাংলা ভাষায় কোরআনের তাফসীর করা :

বাংলাসহ যেকোনো ভাষায় কোরআনের তাফসীর করা ও ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করা সমকালীন আলেমদের দায়িত্ব। সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীন ও কোরআন বোঝা যাতে সহজ হয়, সে জন্য কোরআনের ব্যাখ্যা করে দেওয়া বৈধ। তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তাফসীরকারকের জন্য ওপরে উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হওয়া জরুরি।

অনূদিত কোরআনে অর্থগত পার্থক্য :

বাংলা ভাষায় অনূদিত কোরআনে বহু জায়গায় ভাব ও অর্থগত পার্থক্য দেখা যায়। নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

এক.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

এটি সূরা নিসার প্রথম আয়াতের অংশবিশেষ। আয়াতের এ অংশের অনুবাদে বেশ তারতম্য দেখা যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন লিখেছে,

'আল্লাহকে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১)

বিচারপতি হাবিবুর রহমান লিখেছেন, '...তোমরা মাতৃগর্ভকে (অর্থাৎ জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে) ভয় করো।'

আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লিখেছেন, '...আত্মীয়তা (-এর হক বিনষ্ট করা) হইতেও ভয় করো।'

গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, '...বান্ধবতাকে ভয় কর।'

হাফেজ মুনির লিখেছেন, '...এবং (সম্মান করো) গর্ভ (ধারিণী মা)-কে।'

আসলে এখানে মূল শব্দ 'আরহাম' অর্থ মাতৃগর্ভসমূহ। তাই এখানে গর্ভ বা মাতৃগর্ভ শাব্দিক অনুবাদ হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু এ অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। এখানে আত্মীয়তার বন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

দুই. সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত নিয়ে বাংলাদেশে বেশ আলোচনা দেখা যায়। আয়াতটি হলো :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ করেছে, 'পুরুষ নারীর কর্তা।'

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছেন, 'পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা।'

আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লিখেছেন, 'পুরুষগণ নারীর শাসনকর্তা।'

মুফতি শফি (রহ.) লিখেছেন, 'পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।'

হাফেজ মুনির লিখেছেন, 'পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী।'

তাফসীর ইবনে কাসীরের অনুবাদে লেখা হয়েছে, 'পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।'

এ আয়াতের অনুবাদ নিয়ে সমাজে যে বিভ্রান্তি দেখা যায়, তা কি অনুবাদকদের অসতর্ক শব্দ চয়ন থেকে উদ্গত?

তিন. সূরা ইউনুসের ৪৭ নম্বর আয়াতে রয়েছে :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

উম্মত শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়ে জটিলতা দেখা যায়। উম্মত মানেই কিন্তু জাতি নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ করেছে, 'প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল।'

আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর অনুবাদে রয়েছে, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রহিয়াছেন।'

হাফেজ মুনিরের অনুবাদেও উম্মত শব্দ রেখে দেওয়া হয়েছে।

মুহিউদ্দীন খান (রহ.)-এর অনুবাদে রয়েছে, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একেকজন রসূল রয়েছে।'

এসব অনুবাদ দেখে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে বাঙালি জাতির জন্য কোন নবী এসেছেন? এটা হয়েছে অনুবাদকদের অসর্তকতার সুযোগে।

এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সূরা মুমিনুনের ৫২ নম্বর আয়াতে। সেখানে রয়েছে,

وَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বাংলাদেশের প্রায় সব অনূদিত কোরআনে এ আয়াতে উম্মত শব্দের অর্থ আনা হয়েছে জাতি। অথচ এখানে এ অর্থ সংগত নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন লিখেছে, 'তোমাদের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি....।'

হাফেজ মুনির লিখেছেন, 'অবশ্যই তোমাদের জাতি (কিন্তু দ্বীনের বন্ধনে) একই জাতি।'

গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'তোমাদের এ ধর্ম একমাত্র ধর্ম।'

এখানে সম্বোধন নবীদের প্রতি। উম্মত মানে দ্বীন। এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন,

وإن هـذه أمتكـم أمةواحـدةالمعنى : هذاالذى تقدم ذكره هودينكم وملتكم فالتزموه .والأمةهناالدين

অর্থ : 'হে নবীরা! যে বিষয়ে তোমাদের ইতিপূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা-ই তোমাদের ধর্ম। এখানে উম্মত মানে দ্বীন।'

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন,

وقوله :(وإن هذه أمتكم أمةواحدة) أى :دينـكـم يـامـعشـرالأنبيـاء دين واحـد،وملةواحـدة ،وهـوالـدعـوةإلـى عبادةالله وحده لاشريك له

চার. সূরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াত হলো,

سُبْحَـانَ الَّـذِى أَسْـرٰى بِعَبْدِه لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّـذِى بَـارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ : 'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি।' (সূরা ; বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১)

নিচে দাগ দেওয়া আয়াতাংশের অনুবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লিখেছে, 'যার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়।' বেশির ভাগ অনুবাদক এখানে حول 'হাওল' শব্দের 'আশপাশ' বা 'চারপাশ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখানে 'পরিবেশ' অর্থ কোথায় পেয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাংলা ভাষায় পরিবেশ শব্দের অর্থ চারপাশের অবস্থা (চারপাশ নয়)। আবার পরিবেশ অর্থ পরিধি ও

পরিমণ্ডল। (সূত্র : বাংলা একাডেমি ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান)। আবার ব্যাবহারিক দিক থেকে পরিবেশ শব্দের সঙ্গে গাছপালা ও প্রকৃতির সম্পর্ক আছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানি (রহ.) স্পষ্টভাবে লিখেছেন, حوله الشئ جانبه 'হাওলুশ শাই জানিবুহু।' অর্থাৎ কোনো বস্তুর চারপাশকে 'হাওল' বলা হয়। এ অর্থ কোরআনে বহু আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ) (التوبة : ١٠١)

(قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) (الشعراء ٣٤ :)

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى) (الأحقاف ٢٧ :)

কাজেই কোরআনের অনুবাদে আরো বেশি সতর্ক হওয়ার বিকল্প নেই।

পাঁচ. আরো একটি শব্দের অনুবাদ নিয়ে বেশ জটিলতা দেখা যায়। শব্দটি হলো 'ওলি'। বাংলায় অহরহ এ শব্দের অর্থ করা হয় বন্ধু। অথচ কোরআনে শুধু এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। একাধিক অর্থে কোরআনে 'ওলি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রখ্যাত আরবী অভিধানবিদ ইবনে ফারেস লিখেছেন, 'ওয়াও-লাম-ইয়া'(و ل ى) মূল ধাতু থেকে নির্গত শব্দের মধ্যে 'নৈকট্য' অর্থ রয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানি (রহ.) লিখেছেন, 'এ শব্দমূল থেকে নির্গত শব্দগুলো স্থান, সম্বন্ধ ও ধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈকট্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কোরআনে 'ওলি' শব্দ সাহায্যকারী, হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, অভিভাবক, উপাস্য, মূর্তি, সঙ্গী, সন্তান, আত্মীয় ও উত্তরাধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাবুদ ও রব অর্থে 'ওলি' শব্দের ব্যবহার :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا (انعام ١٤)

সন্তান ও উত্তরাধিকার অর্থে 'ওলি' শব্দের ব্যবহার :

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (مريم ٥)

মূর্তি ও উপাস্য অর্থে 'ওলি' শব্দের ব্যবহার :

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ

আশ্চর্য হলো, বাংলা ভাষায় কোরআনের অনুবাদে এসব পার্থক্য রাখা হয়নি। ফলে এ নিয়ে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অন্য একটি আয়াত দেখুন : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ করেছে, 'মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু।' আমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, এ কথার অর্থ কী? অর্থাৎ কোরআন কি ঈমানদার নারী-পুরুষের অবাধ বন্ধুত্বকে সমর্থন করে? তাহলে পর্দার বিধানের কী হবে? বন্ধুর ঘর থেকে তো না বলে খাবারও খাওয়া যায়! আমি তাঁকে বললাম, সব জায়গায় 'ওলি' মানে বন্ধু নয়। এখানে 'ওলি' মানে সহযোগী ও হিতাকাঙ্ক্ষী।

ছয়. কোরআনের বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ ذكر 'জিকর' বা 'জিকির'। এ শব্দ কোরআনে একাধিক অর্থে এসেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার কোরআনের অনুবাদকেরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। জিকির শব্দের প্রথম ও প্রধান অর্থ হলো দু'আ করা ও মৌখিকভাবে আল্লাহর স্মরণ। এটি জিহ্বার জিকির। যেমন–আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

অর্থ : 'যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির (তাসবিহ-তাহলিল) পাঠ করবে।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১০৩)।

অন্য আয়াতে এসেছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

অর্থ : 'হে ঈমানদাররা, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৪১)

জিকির শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ। আল্লাহ বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা জিকরা বা উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।' (সূরা : জারিয়াত : আয়াত : ৫৫)

জিকির শব্দের তৃতীয় অর্থ হলো স্মরণ করা। পবিত্র কোরআনে এসেছে :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের ওপর অবিচার করলে আল্লাহর জিকির করে (আল্লাহকে স্মরণ করে) এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে?' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৫)

জিকির শব্দের চতুর্থ অর্থ আনুগত্য। আল্লাহ বলেন,

فاذكرونى اذكر كم

''তোমরা আমার জিকির (আনুগত্য প্রদর্শন) করো, আমিও তোমাদের 'জিকির' (প্রতিদান দান) করব।''

জিকির শব্দের পঞ্চম অর্থ কোরআন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ

مُنْكِرُون

'এটা বরকতময় জিকির (কোরআন)। আমি তা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?' (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৫০)

জিকিরের ষষ্ঠ অর্থ মর্যাদা ও গৌরব। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون

'কোরআন তো তোমার ও তোমার জাতির জন্য জিকির বা সম্মানের বস্তু।' (সূরা : জুখরুফ, আয়াত : ৪৪)

জিকির শব্দের সপ্তম অর্থ খবর ও সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

'তারা তোমার কাছে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে তার জিকির (খবর বর্ণনা) করব।' (সূরা : কাহ্ফ, আয়াত : ৮৩)

জিকির শব্দের অষ্টম অর্থ শরীয়ত। পবিত্র কোরআনে এসেছে,

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের জিকির (শরীয়ত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে দুঃসহ আজাবে প্রবেশ করাবেন।' (সূরা : জিন, আয়াত : ১৭)

জিকির শব্দের নবম অর্থ লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক)। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُون

'আমি জিকির বা লাওহে মাহফুজের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন (অথবা নেককার) বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।' (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ১০৫)

জিকির শব্দের দশম অর্থ নামায। হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে,

فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب

'সে বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের জিকির (নামায) থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে গেছি। এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।' (সূরা : সাদ, আয়াত : ৩২)

কোরআনের বাংলা অনুবাদে জটিলতা দূর করার প্রয়াস :

সম্প্রতি খবর বের হয়েছে যে বাংলা ভাষায় অনূদিত কোরআনে যেসব জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেগুলো দূর করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নেবে। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে সাধারণ মানুষের মনে এ উদ্যোগ সম্পর্কে শঙ্কাও দেখা যায়। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো–

(১) বর্তমানে আমাদের দেশে মূল আরবী সংযুক্তি ছাড়া বহু কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের সব আলেমের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেহেতু এসব অনুবাদ প্রকাশ ও বিক্রি করা হারাম, তাই অবিলম্বে এগুলো বাজার থেকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি। অথবা তাদের মূল আরবী সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশ জারি করা যায়।

(২) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ তখনই সর্বজন গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে হবে। তাই এ কাজের দায়িত্ব শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত।

(৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে অনূদিত কোরআন প্রকাশিত হয়েছে, তা সাধু ভাষায় হওয়ায় অনেকের জন্য অর্থ অনুধাবনে অসুবিধা হয়। আমরা মনে করি, বর্তমানে চলিত ভাষায় কোরআন অনুবাদ করা প্রয়োজন।

(৪) খোদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদে কয়েকটি স্থানে জটিলতা ও অসংগতি দেখা যায়, এগুলো দূর করতেও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

(৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত কোরআন বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। বর্তমানে অনেক সংস্থা বিভ্রান্তিমূলক অনূদিত কোরআন বিনা মূল্যে বিতরণ করছে। এতে সর্বসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

(৬) অনুবাদের ক্ষেত্রে কোরআনে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর অনুবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেগুলো সস্থানে রেখে অনুবাদ করে নিচে টীকা লিখে আকারে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যায়।

(৭) কোরআনে যেসব শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে স্থান উপযোগী অর্থ লেখা জরুরি।

(৮) বেশ কিছু আয়াত আছে, যেগুলোর অনুবাদ দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজা প্রয়োজন।

(৯) কোরআনের বাংলা অনুবাদ উর্দু ভাষা থেকে করা হলে সে ক্ষেত্রে আরবী তাফসীর ও ভাষারীতি অনুসরণ করে অনুবাদ করা উচিত।

(১০) বাংলাদেশে পাঠক মহলে বেশ কিছু আয়াতের অপব্যবহার ও বিভ্রান্তি দেখা যায়, সেগুলো চিহ্নিত করে যথাশব্দ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রচলিত খতমে বোখারী অনুষ্ঠান

দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম হাটহাজারী-এর ফাতওয়া

কোরআনে কারীমের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব বোখারী শরীফ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমৃদ্ধ কিতাবটি ভারত উপমহাদেশের সকল কওমী মাদরাসায় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এটি কওমী শিক্ষাধারার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীসের মূল পাঠ্য, তাই শিক্ষাবর্ষ শেষ দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তা সমাপ্ত করার একটি নিয়ম বর্তমানে প্রচলিত। যা খতমে বোখারী মাহফিল, বোখারী শরীফের আখেরী দরস ও দু'আ মাহফিল ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমাদের দেশে কওমী মাদরাসাসমূহের শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় শা'বান মাসে। রজব মাস শুরু হলে খতমে বোখারী মাহফিল আরম্ভ হয়। চলে শা'বান মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি। কোনো কোনো মাদরাসার খতমে বোখারী অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর হলেও কোথাও কোথাও লৌকিকতা, আড়ম্বরতা চোখে পড়ার মতো। ছবি-ভিডিওর মতো নাজায়েয ও হারাম কাজও হয়ে থাকে কোথাও কোথাও।

কওমী মাদরাসায় অনুষ্ঠিত এই খতমে বোখারী মাহফিল সম্পর্কে শরীয়ত কী বলে–এ ব্যাপারে কওমী মাদরাসার মূল দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম হাটহাজারীর মত কী? সবার জানা দরকার, বোঝা দরকার। নিম্নে উভয় প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হলো :

দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া :

দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতা থেকে ১ এপ্রিল ২০১৮ ইং সালে খতমে বোখারীসংক্রান্ত একটি ফাতাওয়া জারি করা হয়। জনৈক মুস্তফা কামালের প্রশ্নের উত্তরে প্রদানকৃত উক্ত ফাতাওয়ায় বলা হয় :

"বহু মাদরাসায় খতমে বোখারী মাহফিল আড়ম্বরতা ও খুবই জাঁকজমকভাবে করা হয়। সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে ছাপানো হয় রংবেরঙের দাওয়াতনামা। আমন্ত্রণ জানিয়ে একত্রিত করা হয় এলাকার লোকজনকে। সাধারণত এই মাহফিলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। খতমে বোখারীকে কেন্দ্র করে এই ধরনের অনুষ্ঠান মোটেও ঠিক নয়; না করা উচিত।

একসময় দারুল উলূম দেওবন্দের বোখারী শরীফের আখেরী হাদীস যেদিন পড়ানো হতো (পূর্বে জানাজানি হয়ে যাওয়ার কারণে) বহু নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে যেত।

দারুল উলূমের আকাবীরগণ এটিকে বন্ধ করার জন্য পরবর্তীতে বোখারী শরীফের আখেরী হাদীস অত্যন্ত চুপিসারে বোখারী শরীফের শেষ হাদীসের পাঠ দান করেন। দেওবন্দি ধারার সকল মাদরাসার দায়িত্বশীলদের দারুল উলূম দেওবন্দের এই নীতি অনুসরণ করা উচিত।

عنوان: شان شوکت کے ساتھ ختم بخاری کی تقریب کا حکم

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: آج کل بہت سے مدارس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس جو خوب شان وشوکت کے ساتھ ہوتا ہے، باقاعدہ تاریخ کا تعین کرکے اشتہارات وغیرہ کے ذریعہ اطراف کے لوگوں جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں عام طور پر مستورات کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہوجاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہئے۔ دارالعلوم دیوبند میں پہلے ختم بخاری کے موقعہ پر اطراف کا ایک بڑا مجمع (مع مستورات) جمع ہوجاتا تھا، اکابر دارالعلوم نے اس پر روک لگائی اور اب دارالعلوم میں کسی تاریخ کی تعیین کے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ بخاری شریف کا آخری درس ہوتا ہے، دیگر مدارس کو اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী-এর ফাতওয়া :

'অধিকাংশ মাদরাসায় খতমে বোখারী উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা হয়। অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত দাওয়াতপত্র ছেপে এলাকার লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ মুনাজাত করা হয়। পানিতে দম করা হয়। এগুলোকে মানুষ বরকতময় পানি মনে করে ঘরে নিয়ে যায়। এই ধরনের অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড অবশ্যই বিদ'আত।'

الجواب ومنه الصدق والصواب: اکثر مدارس میں ختم بخاری پر تقریب وجلسہ ہوتا ہے، نہایت اہتمام سے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، اشتہارات شائع کئے جاتے ہیں، طویل اجتماعی دعا ہوتی ہے، پانی پر دم کیا جاتا ہے، اس کو متبرک سمجھ کر آب زمزم کی طرح اہتمام واحترام کے ساتھ اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، یہ بھی یقیناً خلاف سنت وخلاف طریقۂ سلف صالحین ایک محدث رسم ہے، مثل رسم چہارم، وچہلم اور مثل رسم میلاد اور مثل اثنائے وعظ باآواز بلند درود شریف پڑھنے کے ہیں، نیز نوافل میں تداعی حقیقۃ ہو یا حکما ناجائز اور مکروہ ہے، یہاں دونوں قسم کی تداعی ہے کمالا یخفی، بالجملہ یہ دونوں قسم کی رسمیں بدعت اور محدث فی الدین ہے، ایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ، وکل بدعۃ ضلالۃ۔

(ফাতাওয়া দারুল উলূম হাটহাজারী ১/১২৩)

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী নূর মুহাম্মদ

যাকাতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

এভাবেও বলা যেতে পারে, যাকাত এমন হক তথা অধিকারের নাম, যা বিশেষ বিশেষ ধন-সম্পদে ফরয হয় এবং বিশেষ শ্রেণীর লোক ও খাতে ব্যয় হয়।

হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। যাকাত ফরয হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে একজন মুসলমানের ওপর যাকাত আদায় করা ফরযে আইন এবং এর অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।

যাকাত প্রদানের ফজীলত

যাকাত প্রদানের ফজীলতসংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

حصنوا اموالكم بالزكوٰة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء

তোমরা তোমাদের সম্পদকে বিপদমুক্ত রাখো যাকাত প্রদানের মাধ্যমে। আর দান-সদকার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করো। যেকোনো বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করো। (তাবরানী)

২। হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

اذا اديت زكوة مالك فقد اذهبت عنك شره

যখন তুমি মালের যাকাত আদায় করলে তখন তুমি তার অনিষ্টকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলে। (ইবনে খুযাইমা)

৩। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

ان من تمام اسلامكم ان تؤدوا زكوة اموالكم

তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হলো মালের যাকাত প্রদান করা। (তাবরানী)

৪। আরেক হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

برئ من الشح من ادى الزكوة

যাকাত প্রদানকারী কৃপণতামুক্ত। (তাবরানী)

৫। হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

لايقبل الله صلاة رجل لا يؤدى الزكوة حتى يجمعهما فان الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما

যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না আল্লাহ তা'আলা তার নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উভয়টি আদায় না করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতএব তোমরা কার্যক্ষেত্রে এ দুটির মাঝে বিভাজন তৈরি করো না। (কানযুল উম্মাল ১৫৭৮৪)

অনাদায়ে শাস্তি

ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়ীর জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর তা দ্বারা তাদের কপালে তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে তার মজা ভোগ করো। (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩৪, ৩৫)

যাকাত প্রদান না করলে ভয়াবহ শাস্তির কথা অসংখ্য হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك

আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন; কিন্তু সে তার যাকাত প্রদান করল না তাহলে কিয়ামতের দিন ওই সম্পদকে বিষাক্ত সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর থাকবে দুটি কালো চিহ্ন। কিয়ামতের দিন এই সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরবে। অতঃপর সে তাকে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সাধের মাল ও রক্ষিত সম্পদ। (বোখারী)

২। ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

لم يمنع قوم زكوة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না তারা অনাবৃষ্টিতে পতিত হবে, যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে তারা অনাবৃষ্টিতেই থাকত। (তাবরানী)

৩। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكوٰة

জলে ও স্থলে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার একমাত্র কারণ যাকাত প্রদান না করা। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৪। হযরত বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

ما منع قوم الزكوٰة الا ابتلاهم الله بالسنين

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্ভিক্ষে পতিত করবেন। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৫। আদী বিন হাতেম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

يوشك ان يأتى على الناس زمان يشق على الرجل ان يخرج فيه زكوة ماله

একটি সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদের যাকাত প্রদান করাকে কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করবে। (তাবরানী)

যাকাত ফরয হওয়ার ভিত্তি

যাকাত ফরয হওয়ার মূল ভিত্তি হলো, বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

যাকাতের শর্ত

শর্ত দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

২. আদায় সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

এক. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং পরাধীন গোলাম বান্দির ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দুই. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিম ও মুরতাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

তিন. বালেগ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। উল্লেখ্য, সদকায়ে ফিতর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপরও ওয়াজিব।

চার. বুদ্ধি ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া। অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

পাঁচ. ধন-সম্পদ যাকাতের উপযোগী হতে হবে। এ ধরনের সম্পদের একটি মৌলিক সূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্বর্ণ।

২. রুপা।

৩. দেশি-বিদেশি কারেন্সি।

৪. ব্যাবসায়িক পণ্য। (এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।)

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদি।

৬. গৃহপালিত পশু, যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে।

৭. খনিজ সম্পদ।

ছয়. সম্পদ নিসাবের পরিমাণ হওয়া বা নিসাবের সমমূল্যের হওয়া।

যাকাতের রুকন

যাকাতের রুকন হলো, নিসাবের নির্দিষ্ট একটি অংশকে নিজের মালিকানামুক্ত করে যাকাত নেওয়ার উপযোগী কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া বা তার প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা। (বাদায়ে ২/৩৯)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। শরয়ী কারণ ছাড়া আদায়ে বিলম্ব করা গোনাহ। (শামী ২/২৭১-২৭২, ফতহুল কদীর ২/১৬৫-১৬৬)

কতবার আদায় করতে হবে

ক. স্বর্ণ, রুপা, মুদ্রা, গবাদি পশু ও ব্যাবসায়িক পণ্যে যাকাত বছরে একবার।

খ. শস্য ও ফলফলাদি যতবার উৎপন্ন হবে, ততবার। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৪)

অগ্রিম যাকাত প্রদান

ক. নিসাবের মালিক হওয়া ছাড়া অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. নিসাবের মালিক হয়ে বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (বাদায়ে ২/৫০)

সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে

ক. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর বিনা কারণে যে পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে, ততটুকুর যাকাত মাফ হয়ে যাবে। পুরো ধ্বংস হলে পুরোটাই রহিত হয়ে যাবে।

খ. ইচ্ছাকৃত ধ্বংস বা নষ্ট করলে হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং পুরো হিসাব মোতাবেক যাকাত দিতে হবে। (ফতহুল কদীর ২/১৭৯)

নিসাবের বিবরণ

ক. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা = ৮৭.৪৮০ গ্রাম।

খ. রুপা ৫২.৫ তোলা = ৬১২.৩৬০ গ্রাম। (আওযানে মাহমুদা, পৃ. ১০৪)

উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ব্যাবসায়িক পণ্যের নিসাব নির্ধারণে স্বর্ণ-রুপা হলো পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনদের জন্য যেটি বেশি লাভজনক হবে, সেটিকে পরিমাপক হিসেবে গ্রহণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং মুদ্রা ও পণ্যের বেলায় বর্তমানে রুপার নিসাবই পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, যার নিকট ৫২.৫ তোলা সমমূল্যের দেশি-বিদেশি মুদ্রা বা ব্যাবসায়িক পণ্য মজুদ থাকবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

সাত. সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা, অর্থাৎ সম্পদে অন্যের কোনো হক/

অধিকার না থাকা এবং তাতে মালিকের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হওয়া। (আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

আট. চন্দ্র মাসে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

উল্লেখ্য, চন্দ্র মাস হিসাবে যাকাত আদায় করলে যাকাতের পরিমাণ হবে ২.৫%, সৌরবর্ষ হিসাবে দিলে যাকাত দিতে হবে ২.৫৮%।

শস্য, ফলমূল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং উৎপাদন ও উত্তোলন শর্ত। (আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

বি.দ্র. নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু এবং শেষে বিদ্যমান থাকা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে সম্পদের পরিমাণ নিসাব থেকে কমে গেলেও বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে' ২/৫১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫৫)

নয়. ঋণমুক্ত হওয়া

উল্লেখ্য, ব্যাংক থেকে উত্তোলিত ব্যাবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ঋণ গ্রহণ করে তা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যদি ব্যয়ের খাত এমন কোনো পণ্য হয়, যা যাকাতের আওতায় পড়ে তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি ব্যয়ের খাত যাকাতের আওতায় না পড়ে (যেমন–কোম্পানির ইমারত, মেশিন, পরিবহন ইত্যাদি) তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে না। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত ওয়া তিজারত, পৃ. ৯৪)

দশ. হাজতে আসলিয়্যাহ থেকে অতিরিক্ত হওয়া। হাজতে আসলিয়্যাহ বলতে এমন প্রয়োজনকে বোঝানো হয়, যা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন–আহারীয় খরচাপাতি, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬২)

এগারো. সম্পদবর্ধিষ্ণু হওয়া। অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব হওয়া। আর গবাদি পশু স্ববর্ধিত বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

যাকাত আদায় সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

এক.

নিয়্যাত করা

নিয়্যাত করার সময়

ক. উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদানকালে।

খ. নিয়্যাতবিহীন প্রদান করলে উপযুক্তের হাতে মাল থাকাবস্থায়।

গ. নিজের উকিলের হাতে সোপর্দ করার সময়।

ঘ. মূল নিসাব হতে যাকাতের পরিমাণ পৃথক করার সময়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮)

দুই.

উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৯)

ব্যাবসায়িক পণ্যের সংজ্ঞা

ব্যাবসায়িক পণ্য বলতে স্থাবর-অস্থাবর ওই সব পণ্যকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উদ্দেশ্য। পণ্যটি অবিকল বিক্রি করা হোক অথবা শিল্পায়নের পর। পণ্যের মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ হোক অথবা বিনিময় ছাড়া। (আল মা'আঈর নং ৩৫)

ব্যাবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

ক. ব্যাবসায়িক পণ্যের মূল্য রুপার নিসাবের সমমানের হতে হবে।

খ. পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

গ. পণ্য ক্রয় বা মালিকানা অর্জনের সময় ব্যবসার নিয়্যাত করা। ক্রয়ের সময় নিয়্যাত না করলে ব্যাবসায়িক কার্যক্রমের সময় নিয়্যাত করা।

ঘ. পণ্য ব্যবসার নিয়্যাতের উপযোগী হওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/২১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৭১০)

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

পণ্য যে স্থানে মজুদ থাকবে সে স্থানের মার্কেট রেটে পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে পাইকারি সেলাররা পাইকারি রেট, খুচরা বিক্রেতারা খুচরা দর, আর যেসব ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচরা উভয়ভাবে পণ্য সেল করে থাকে তারা যে দিকটির প্রধান্য থাকবে, সেটির ভিত্তিতে পণ্যের মূল নির্ধারণ করবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা/পণ্য

ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা দ্বারা প্রদান করাটাই মূল বিধান। তবে যাকাতের মুস্তাহিকদের স্বার্থ রক্ষা হলে সরাসরি পণ্য দ্বারাও যাকাত আদায় করা যাবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

পণ্যে একাধিক কারণ পাওয়া গেলে

কোনো পণ্যে ব্যবসার নিয়্যাতের পাশাপাশি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো কারণ পাওয়া গেলে, যেমন পণ্যটি গবাদি পশু বা কৃষিপণ্য, তাহলে এ ক্ষেত্রে এসব পণ্যের যাকাত ব্যাবসায়িক পণ্য হিসেবেই দিতে হবে। পশু বা কৃষিপণ্য হিসেবে নয়। (আল মাআঈর নং ৩৫)

যাকাতের আওতাভুক্ত পণ্যসামগ্রী

১. সব ধরনের কাঁচামাল (বাজারদরে)।

২. যেসব পণ্য কারিগরি পরিবর্তনসহ বা ছাড়া বিক্রির জন্য রাখা হয়। (বাজারদরে)

৩. উৎপাদিত পণ্য।

৪. প্রক্রিয়াধীন পণ্য, এ ক্ষেত্রে যেদিন যাকাত ওয়াজিব হবে ওই দিনের বাজারদর ধর্তব্য হবে। কোনো কারণে বাজারদর জানা সম্ভব না হলে খরচাসহ ক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে।

৫. গুদামে মজুদ পণ্য, বাজারদর বিবেচিত হবে।

৬. রাস্তায় আনার পথে যেসব পণ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পণ্য যে স্থানে বা যে স্থানের কাছাকাছি থাকবে, সেখানের বাজারদর ধর্তব্য হবে।

৭. যেসব পণ্য ক্রয় প্রতিনিধির কাছে ওকালতির ভিত্তিতে রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও

স্থানের বিবেচনায় দর নির্ণয় করে যাকাত দিতে হবে।

৮. ট্রেড মার্ক। বর্তমানে ট্রেড মার্কও একটি মূল্যমানসম্বলিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত। তাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেড মার্ক নিলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে।

৯. برامج الحاسوب সফটওয়্যার। বর্তমান সময়ে এটিও একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত সফটওয়্যারের যাকাত আদায় করতে হবে।

১০. প্যাকেজিং, কার্টনজাতকরণের উপকরণ। যদি তা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হয় এবং এর প্রভাব পণ্যের মূল্যের ওপর পড়ে তখন এসব উপকরণও যাকাতের আওতায় চলে আসবে।

১১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি।

১২. ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব জমি, ফ্ল্যাট, পরিবহন ইত্যাদি ক্রয় করা হয় সেগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে না। তবে ভাড়া বাবদ যে অর্থ অর্জিত হবে, তা যাকাতের উপযোগী অন্য আসবাবের সাথে যোগ হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৮)

১৩. শেয়ার, শেয়ার ক্রয় Dividend-এর জন্য হলে দেখতে হবে ক্রয়কৃত শেয়ার-কোম্পানির কী পরিমাণ যাকাত উপযোগী ও অনুপযোগী সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। যার পক্ষে এটা জানা সম্ভব সে শুধুমাত্র যাকাতের উপযোগী সম্পদ অনুপাতে যাকাত আদায় করবে। যার জন্য এটা জানা অসম্ভব সে সতর্কতামূলক বাজারদরে শেয়ারের যাকাত আদায় করবে।

আর শেয়ার দ্বারা Capital gain উদ্দেশ্য হলে এটি ব্যাবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর পূর্ণ মূল্যের যাকাত প্রদান করতে হবে। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত, পৃ. ৯৩-৯৪ আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৫)

১৪. ব্যাংক হিসাব ও লকারে যেসব অর্থ ও যাকাত উপযোগী সম্পদ জমা থাকবে সেগুলোর যাকাতও প্রদান করতে হবে। সুদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমাকৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে। এতে সুদ যোগ হবে না। তবে সমুদয় সুদ সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের সাথে মুনাফাও যোগ হবে। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৫. বন্ড, অভিহিত মূল্যের সাথে খরচাপাতিও যোগ হবে। তবে অর্জিত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এতে যাকাত আসবে না। সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৬. সব ধরনের বিনিয়োগ সুকুক, যতটুকু সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে সে অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর ৩৫, পৃ. ৪৭৬)

১৭. স্বর্ণ-রুপার স্টক, আকার-আকৃতি যা-ই হোক না কেন।

১৮. Retention amount (মা'আঈর পৃ. ৪৭৬)

১৯. বায়নাপত্রে অগ্রিম যে অর্থের লেনদেন হয় এর যাকাত বিক্রেতাকে দিতে হবে। (মা'আঈর ৪৭৬)

২০. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু।

২১. সুকুকে মুকারাযা

২২. خيـــــار (option) কালীন পণ্যের যাকাত মালিকের ওপর ওয়াজিব। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৭)

২৩. বেচাকেনা সলম পদ্ধতিতে হলে মূল্যের যাকাত বিক্রেতা প্রদান করবে। ক্রেতার হস্তগত হওয়ার আগে পণ্যের বিধান ঋণের যাকাতের মতো। আর হস্তগত হওয়ার পর এর বিধান ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো। যদি এর দ্বারা ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য হয়। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৪. ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান সলমের মতোই হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৫. ঋণের যাকাত

ক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়। অথবা অক্ষম কিন্তু ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিংবা অস্বীকার করে কিন্তু পাওনাদারের কাছে শরয়ী প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় পাওনাদার ওই অর্থ ফেরত পাওয়ার পর হিসাব করে বিগত দিনসমূহের যাকাত আদায় করবে।

খ. আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে কিংবা অস্বীকার করে এবং পাওনাদারদের নিকট কোনো শরয়ী প্রমাণও না থাকে। এমতাবস্থায় যদি কোনো সময় এই ঋণ পাওনাদারের হস্তগত হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে এর যাকাত প্রদান করতে হবে। বিগত দিনের যাকাত দিতে হবে না।

(বাদায়েউস সানায়ে ২/১০, আদ্দুররুল মুখতার ও শামী ২/২৬৬-২৬৭ আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৭২,২/৬৭৭)

২৬. সমুদ্র থেকে যেসব জিনিস আহরণ করা হয়। যেমন মাছ, মূল্যবান পাথর, হীরা, মুক্তা, ঝিনুক ইত্যাদি। ব্যবসার উদ্দেশ্যে এগুলো আহরণ করা হলে ব্যাবসায়িক পণ্যের ন্যায় এগুলোরও যাকাত প্রদান করতে হবে।

২৭। ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেসব গবাদি পশু লালন-পালন বা ক্রয় করা হয় ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো বাজারদরে সেগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

২৮। গবাদি পশু ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হলে এগুলোর ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ব্যাবসায়িক পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

২৯। ডেইরি ফার্মের গাভি এবং ডিমের ফার্মের মুরগি-হাঁস ও কোয়েলের যাকাত দিতে হবে না। তবে দুধ ও ডিম বিক্রি করে যা আয় হবে, তার যাকাত দিতে হবে। যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার

অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়।

৩০। বয়লার ফার্মের মোরগ এবং গরু, ছাগল মোটাতাজাকরণের ফার্মের গরু-ছাগল ব্যাবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো বাজারদরে এসব প্রাণীর যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর নং ৩৫)

যাকাতের পরিমাণ

১. স্বর্ণে	২.৫%
২. রুপায়	২.৫%
৩. দেশি-বিদেশি মুদ্রা	২.৫%
৪. ব্যাবসায়িক পণ্য	২.৫%

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য ও ফলফলাদিতে ৫% বা ৭.৫% অথবা ১০%

৬। খনিজ সম্পদ ২.৫%

(আল মা'আঈর নং ৩৫)

হারাম মাল

ক. জাতিগত হারাম হলে, যেহেতু এটি শরীয়ত নিষিদ্ধ তাই এতে যাকাতের হুকুম জারি হবে না। যেমন : শূকর, মদ ইত্যাদি।

খ. বিশেষ কোনো কারণে হারাম। যেমন : স্বর্ণ-রুপার তৈরি মূর্তি। প্রকৃত মুমিনের জন্য এর আকৃতি মিটিয়ে দিয়ে স্বর্ণ-রুপার যাকাত প্রদান করা জরুরি।

গ. অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ। যেমন : চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি-হাইজ্যাক, সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি, গান-বাদ্য করে উপার্জিত সম্পদ ও শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত পন্থায় উপার্জিত অন্য কোনো সম্পদ যেহেতু এই সম্পদগুলোর মালিক সে নয়, বিধায় তাকে এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। বরং এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শরীয়তের বিধান। বিহিত কারণে সম্ভব না হলে পুরো সম্পদ সদকা করে দিতে হবে। (শামী ২/২৯০-২৯১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৫৪)

সন্দেহজনক মাল

কোনো মালের ব্যাপারে হালাল নাকি হারাম–এ মর্মে সন্দেহ হলে কোনো বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সাথে আলোচনা করে সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে যাকাতের রুকন হলো, উপযুক্ত কাউকে পরিপূর্ণভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে না দিয়ে লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা বিলিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। (সূরা তাওবা ৬০)

যাকাতের অর্থে ট্যাক্স প্রদান

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য আসমান-জমিনের। যাকাত নিখুঁত একটি ইবাদত। আর ট্যাক্স রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি জিনিস। অতএব, দুটিকে এক মনে করে যাকাতের অর্থ দ্বারা ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না। (শামী : ২/২৭০)

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে?

যেদিন আদায় করা হবে, সেই দিনের পণ্য মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে। (শামী ২/২৮৬)

পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মালিকানা কখন লাভ হবে?

কন্ট্রাক্ট FOB-এর ভিত্তিতে হলে মাল লোড হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা স্বত্ব লাভ হবে। আর CIF-এর ভিত্তিতে হলে মাল বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৬)

যেসব জিনিসের যাকাত নেই

১. নিজেদের ব্যবহৃত ইমারত ভবন।

২. অফিশিয়াল যাবতীয় আসবাব।

৩. গুদামঘর।

৪. কাজের স্বার্থে যেসব জিনিস ক্রয় করা হয় । যেমন : এসি, ফ্যান, এয়ারকুলার, কম্পিউটার ইত্যাদি।

৫. কারিগরি স্বার্থে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি।

৬. খুচরা যন্ত্রাংশ।

৭. কোম্পানির স্বার্থে ক্রয়কৃত মালবাহী বা মানুষবাহী পরিবহন।

৮. ভাড়া দেওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি বা অন্য কিছু।

৯. কোম্পানির ভবন বা দফতর নির্মাণের জন্য ক্রয়কৃত জমি।

১০. কার্টন, প্যাকেজিংজাতীয় আসবাব, যা শুধুমাত্র পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয় করা হয়। বিক্রি বা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য নয়।

১১. পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব জিনিস এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে এর কোনো অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন : জ্বালানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত সাবান ইত্যাদি।

বি.দ্র. এ-জাতীয় পণ্যের যতটুকু বছরের শেষ দিন মজুদ থাকবে, তা অবশ্যই যাকাতের আওতায় পড়বে। শুধুমাত্র যতটুকু ব্যবহার হবে, ততটুকুই বাদ যাবে। (মা'আঈর ৪৭৮)

১২. পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কুকুর। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

১৩. Charitable fund ও Trust

১৪. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। (মা'আঈর ৪৭৩)

১৫. কোনো কন্ট্রাক্ট বাবদ যে অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়। (মা'আঈর ৪৭৯)

১৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য।(পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর যাকাত প্রদান করতে হবে তবে ওই পশুসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যাকাত দিতে হবে না।) (হিন্দিয়া ১/১৮০, আল মৌসু'আ ২৩/২৭৪)

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র বা 'মাসারিফ'

পবিত্র কোরআনে কারীমে আট ধরনের লোকদের যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন : ইরশাদ হচ্ছে–

প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও

মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীর, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তা ছাড়া দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক। (সূরা তাওবা ৬০)

কোরআনে উল্লিখিত আট ধরনের লোকদের মধ্যে এক প্রকার হলো অমুসলিমদের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাত দেওয়া। হযরত উমর (রা.)-এর জামানায় ইসলামের ব্যাপকতা লাভ ও মুসলমানদের ব্যাপক শক্তি অর্জিত হওয়ার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় তালীফে কলবের জন্য যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেন। ওই সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমরের (রা.) এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট থাকে সাত ধরনের লোক, তারা কারা? এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ফকীর, ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, যদিও ওই ব্যক্তি কর্মক্ষম ও কর্মরতও হয়।

২. মিসকীন, ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মালিকানায় কোনো ধরনের সম্পদ না থাকে।

উল্লেখ্য, নিজের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ফকীর-মিসকীন হলেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে নিজের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, খালা, মামা, সৎমা, শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাতাকে ফকীর বা মিসকীন হওয়ার শর্তে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩. আ'মেল তথা যাকাতের মাল সংগ্রহকারী; ইসলামী হুকুমতের বায়তুল মাল কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের সংগৃহীত যাকাতের সম্পদ থেকে বিনিময় প্রদান করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কমিশন হারে যাকাত থেকে বিনিময় প্রদান কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়।

৪. গোলাম, অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে আজাদ হওয়ার জন্য গোলামকে যাকাত প্রদান করা। বর্তমানে এই খাতটিও বিদ্যমান নেই।

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তি এই পরিমাণ ঋণী হলে যে ঋণ আদায় করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না। এমন ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া বৈধ।

৬. আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তি, যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ না থাকলে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, ইমামগণের নিকট আল্লাহর রাস্তা বলতে নির্ধারিত খাতকে বোঝানো হয়েছে। তাই কোনো ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা বা অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর রাস্তায় আছি মনে করে যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত দাবি করার কোনো অবকাশ নেই।

৭. মুসাফির, কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোথাও সফরে এসে সম্পদ শূন্য হয়ে পড়লে, তাকে বাড়িতে পৌঁছতে পারে পরিমাণ যাকাত প্রদান করা। উল্লিখিত সব খাতে অথবা যেকোনো একটি খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এই খাতগুলো ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। চাই সেটি যতই ভালো কাজ হোক না কেন। তাই মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং কোনো প্রকল্প, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়–এমন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

সংশয় ও নিরসন

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মাসারিফে যাকাত' বলা হয়। এটিও স্পষ্ট হয়েছে যে যাকাত যাকে প্রদান করা হবে তাকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়েই দিতে হবে।

এ পর্যায়ে একটি সংশয়ের নিরসন প্রয়োজন। সেটি হলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। এর হুকুম কী হবে?

মূলত যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে থাকে তার মধ্যে কওমী মাদরাসাসমূহ অন্যতম। এ সকল মাদরাসায় যাকাত নেওয়ার উপযোগী বহু ছাত্র পড়ালেখা করতে আসে। তাদের জন্যই মূলত এই যাকাত সংগ্রহ করা হয় এবং তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওই সকল ছাত্রকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। তাই যে সকল মাদরাসা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয়, সে সকল মাদরাসায় যাকাত দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

রয়ে গেছে অন্যান্য সংগঠন সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন সংগঠন, এমনকি টিভি চ্যানেলও ইসলামের খেদমতের নামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের কাছে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের কোনো ক্ষেত্র থাকা স্পষ্ট নয়। তাই ওই সকল সংগঠন ও প্রকল্পে যাকাত প্রদানে সতর্ক থাকা জরুরি।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : যাকাত/কোরবানী

মাও. মোহাম্মদ ইউসুফ

জিজ্ঞাসা :

জনৈক মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে বার্ষিক খরচ বাবদ ৫০০০ টাকা পায়। যার কিছু অংশ সর্বাবস্থায় তার কাছে থাকে, এ ছাড়া তার কাছে দুই ভরি স্বর্ণের গয়না আছে, যার মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা রুপার মূল্যের চেয়েও বেশি। এখন আমার জানার বিষয় হলো।

(ক) উক্ত স্বর্ণের ওপর বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

(খ) এবং তার ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কোরবানী বা সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে কি না? এবং সর্বাবস্থায় উক্ত টাকার হুকুম কী?

সমাধান :

শরীয়তে এককভাবে শুধু স্বর্ণ বা রুপা নিসাব পরিমাণের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হয় না, তবে স্বর্ণ-রুপার পাশাপাশি প্রয়োজনাতিরিক্ত নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল থাকলে, উভয়টার মূল্য একত্রে মিলানোর পর রুপার নিসাব পর্যন্ত পৌঁছলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

(ক) তাই প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার স্বামীর কাছ থেকে বার্ষিক খরচ বাবদ প্রাপ্ত টাকার বেঁচে যাওয়া অংশ এবং তার কাছে থাকা দুই ভরি গয়নার মূল্য একত্রে মিলালে রুপার নিসাব পূর্ণ হওয়ায় বছর অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত মহিলার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

(খ) কোরবানীর দিনগুলোতে ও ঈদুল ফিতরের দিন নিসাব ঠিক থাকলে কোরবানী ও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়। (রদ্দুল মুহতার-২/৩০৩, বদায়ে সানায়ে-২/৪০৫, ফাতাওয়ায়ে হক্বানিয়া-৩/৫১৬)

প্রসঙ্গ : পশুর বর্গা দেওয়া

মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন

নর্দ্দা, ভাটারা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

গবাদি পশু বর্গা দেওয়ার সহীহ পদ্ধতি কী? কোরআন-হাদীস ও ফিকহের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

গবাদি পশু বর্গা দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি তথা পশুর মালিক কোনো ব্যক্তিকে এই শর্তে পশু পালতে দেওয়া যে, তা থেকে যে লাভ হবে তা উভয়ের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে। এটা ইজারায়ে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাজায়েয। তবে এর বিকল্প সহজ একটি পদ্ধতি হলো, একটি পশু দুজন মিলে খরিদ করে এক পক্ষ মোটা অংকের মূল্য পরিশোধ করবে আর অপর পক্ষ সামান্য পরিমাণ আদায় করবে। যথা একটি গরুর মূল্য ৫০ হাজার টাকা এর থেকে একজন ৪৯ হাজার টাকা পরিশোধ করবে, আর অপরজন এক হাজার টাকা দিয়ে শরিক হবে, এতে জায়েয হওয়াতে কোনো বাধা রইল না। অতঃপর গরুটি লালন-পালন করে বিক্রি করার পর একজন মূলধনের ৪৯ হাজার আর অপরজন মূলধনের এক হাজার টাকা নেওয়ার পর যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করবে, উল্লেখ্য এটা মূলত অংশীদারিত্বের চুক্তি। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২৩/৪১৩, রদ্দুল মুহতার-৬/৪৭৮)

প্রসঙ্গ : ভিডিও কল

মুহাম্মদ ইব্রাহিম

কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা মেসেঞ্জারে ভিডিও কল, ইমো হোয়াটসআপ ইত্যাদিতে ভিডিও কলে কথা বলা ও কলের ভিডিও ধারণ করার শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধতা কতটুকু? জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

ভিডিও কলের মাধ্যমে বৈধ জিনিস দেখা বৈধ আর অবৈধ জিনিস দেখা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে, অনুরূপ এ ধরনের কলের মাধ্যমে মানুষ বা প্রাণীর ভিডিও ধারণ করাও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। (বোখারী শরীফ-৫৯৫১, ফয়জুল বারী-৬/১১১, ফাতহুল মুলহিম-৩/১৬৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদ/মাদরাসা

মুহাম্মদ আ. সামাদ

মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মাদরাসার অধীনে বরাদ্দকৃত জমি থাকা সত্ত্বেও তাতে মাদরাসা নির্মাণ না করে মাদরাসার আয়-উন্নতির জন্য বাজার বা মার্কেট করে মসজিদের ওপর স্থায়ীভাবে মাদরাসা পরিচালনা করা জায়েয আছে কি না? কোরআন-সুন্নাহর দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

মাদরাসার জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে মাদরাসা নির্মাণ না করে মাদরাসার আয়-উন্নতির জন্য বাজার বা মার্কেট নির্মাণ করে মসজিদে স্থায়ীভাবে মাদরাসা পরিচালনা করা জায়েয হবে না। অতি সত্বর মাদরাসার জায়গা খালি করে সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। তবে সেখানে তা'লীমের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে মসজিদের আদব রক্ষার সাথে তা'লীম দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদির-২/২১২, কিফায়াতুল মুফতী-১০/৩৩৯, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৯/১৮৫)

প্রসঙ্গ : আলেমের সাথে বেয়াদবি

মুহাম্মদ ফজলুল হক
পল্লবী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক মুসল্লির মসজিদের খতীব সাহেবের সঙ্গে কোনো এক কারণে মনোমালিন্যতা হলে একপর্যায়ে খতীব সাহেব উক্ত মুসল্লিকে উদ্দেশ করে জনসমক্ষে এ কথা বলেন যে, ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আলেমদের সাথে বেয়াদবি করলে কবরে তার চেহারা কেবলার দিক থেকে ফিরে যাবে। আমি আমার মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যাব যে জনৈক মুসল্লি মৃত্যুবরণ করলে তার কবর খুঁড়ে দেখিও যে তার চেহারা কেবলার দিক থেকে ফিরে গেছে কি না? এখন প্রশ্ন হলো :

১. উক্ত কথা আসলেই ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন কি না?

২. উক্ত খতীব সাহেবের জন্য মুসল্লিকে লক্ষ্য করে এমন অভিশাপমূলক কথা বলা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান :

১. প্রশ্নে উল্লিখিত কবরের আজাবসংক্রান্ত কথাটি ইমাম গাযালী (রহ.) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এটি মুফতী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, যা "তাযকিরাতুর রশিদ" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে।

২. খতীব সাহেব উক্ত মুসল্লিকে লক্ষ্য করে আলেমদের সাথে দুর্ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে কোনো প্রকার দোষ নেই। কেননা সে গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কথা শুধু নকল করেছেন। তবে কোনো দ্বীনি বিষয় নিয়ে মুসল্লির জন্য খতীব সাহেবের সাথে দুর্ব্যবহার কথা শরীয়তসম্মত নয়, বরং মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই তার জন্য খালেছ তাওবাহ করা জরুরি ও খতীব সাহেবের কাছে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক। তবে খতীব সাহেবের অসিয়ত করার ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত। সুতরাং এ ধরনের উক্তি হতে বেঁচে থাকা খতীব সাহেবের জন্য জরুরি। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/২৭০, বাহরুর রায়েক-৫/২০৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৪/৮১)

প্রসঙ্গ : ইশরাক ও চাশতের সময়

শাহাদাত আলী
দরগাহপাড়া, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমরা বিভিন্ন কিতাব পত্রিকা এবং সম্প্রতি প্রকাশিত ক্যালেন্ডারগুলোতে ইশরাক ও চাশতের নামাযের উল্লিখিত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি, যার কারণে জিজ্ঞাসিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ওই দুটি নামাযের সময় বলে দেওয়া সম্ভব হয় না। সেহেতু বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের দেশে সূর্যদয়ের কতক্ষণ পর ইশরাক ও চাশতের নামাযের সময় শুরু হয় তা শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

উপমহাদেশের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে সূর্যোদয়-পরবর্তী মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হতে সময় লাগে ১০ মিনিট, বিধায় সূর্যোদয়ের ন্যূনতম ১০ মিনিট পরই ইশরাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়। আর ইশরাকের নামাযের পর থেকে চাশতের সময় আরম্ভ হয়ে যায়। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর চাশতের নামায পড়া উত্তম। (মাআরিফুস সুনান-৪/২৬, মিরকাত-৩/৩৫৪, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৪৬৭)

প্রসঙ্গ : ঈদের নামাযের পর দু'আ ও কোলাকুলি

মুহাম্মদ ছবুর রহমান
মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

১. আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে ঈদের নামাযে দু'আ করা হয় না। বরং খোতবা পাঠ শেষ করে দু'আ করা হয়। কেউ নামাযের পর দু'আ করলে কিছু কিছু মুসল্লি তা নিয়ে সমালোচনা করে থাকে। আমার জানার বিষয় হলো, এরূপ খোতবা পড়ে দু'আ করার বিধান কী? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

২. আমাদের দেশের কিছু কিছু এলাকায় এ প্রচলন লক্ষ করা যায় যে ঈদের নামাযের পর লোকেরা কোলাকুলির জন্য একে অপরের দিকে এগিয়ে যায়, কেউ অতি আনন্দের সাথে কোলাকুলি করে। আবার কেউ এটা বিদ'আত বলে বিরত থাকে। আমার প্রশ্ন হলো, এ ধরনের কোলাকুলির হুকুম কী? দলিলসহ

জানতে চাই।

সমাধান-১ :

ঈদের নামাযের পর পর দু'আ করা মুস্তাহাব, তবে যদি খোতবার পর সুন্নাত ও জরুরি মনে না করে দু'আ করে তাহলে দু'আ করার অবকাশ রয়েছে। অতএব যে এলাকায় যে ধরনের প্রচলন রয়েছে, তার বিপরীত করে সমালোচনা বা বিভেদ সৃষ্টি করা অনুচিত। (বোখারী শরীফ-১১০১, মিশকাত শরীফ-১/১২৫, মিরকাত-৩/৪৮৩)

সমাধান-২ :

ঈদের নামাযের পর পর কেউ ঈদের অংশ বা ইবাদত মনে না করে ঈদের খুশি হিসেবে কোলাকুলি করলে তার অবকাশ রয়েছে, তবে এটাকে ঈদের অংশ বা ইবাদত মনে করা হলে বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। (আবু দাউদ শরীফ-১০২৬, মিরকাত-৮/৪৯৪, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া-৫/৫৩)

প্রসঙ্গ : মাজুরের নামায

মুহাম্মদ ফরিদ মিয়া
কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

আমি নামাযে তাশাহহুদের মতো বসে নামায পড়তে অক্ষম। এমতাবস্থায় যদি ছোট মোড়ায় বসি তাহলে সেজদা মাটিতে কপাল রেখে করতে পারি, তবে কিয়াম ও রুকু দাঁড়িয়ে করা সম্ভব হয় না, দাঁড়ানো থেকে মোড়ায় আসতে কষ্ট হয়। আর যদি চেয়ারে বসে নামায পড়ি, তাহলে কিয়াম দাঁড়িয়ে রুকু-সেজদা চেয়ারে বসে ইশারায় আদায় করতে পারি। তবে এ ক্ষেত্রে মাটিতে কপাল রেখে সেজদা ছুটে যায়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমি কোন পদ্ধতিতে নামায আদায় করব। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

আপনি যেহেতু মোড়ায় বসে মাটিতে সেজদা করতে সক্ষম তাই চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সেজদার মাধ্যমে নামায আদায় করলে আপনার নামায সহীহ হবে না। অতএব আপনার করণীয় হলো, মোড়ায় বসে রুকু এবং সেজদা মাটিতে করে নামায আদায় করা। (রদ্দুল মুহতার-২/৯৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/৫১)

প্রসঙ্গ : নামায-রোযার কাফফারা

হাফেজ আব্দুল করিম
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমার পিতা মাওলানা আব্দুছ ছবুর গত ২৪/৮/২০১৭ ইং ইন্তেকাল করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়েছিলেন, তিনি কোনো কথা মনে রাখতে পারতেন না, কোনো মানুষকে চিনতে পারতেন না, নামাযের কথা বলতেন; কিন্তু বারবার ওজু করতেন এবং বারবার নামায পড়তেন, রোযা তাঁর জানা ছিল না এবং বুঝতেনও না। উক্ত অবস্থায় তাঁর নামায ও রোযার কাফফারা দিতে হবে? আর দিতে হলে কিভাবে দিতে হবে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

সমাধান :

প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার পিতা একেবারে বেহুঁশও ছিলেন না এবং পূর্ণ পাগলও ছিলেন না। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে নামায-রোযার কাফফারা আদায় করার জন্য অসিয়ত করে গেলে তাঁর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তা আদায় করে দেওয়াই সতর্কতার দাবি। অসিয়ত না করলে আপনার নিজ উদ্যোগে আদায় করলেও আশা করা যায় আল্লাহ তাঁকে মাফ করবেন। (রদ্দুল মুহতার-৩/২৫৮, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৮/১১৭, ফাতাওয়ায়ে বাইয়েনাত-২/৩৮৫)

প্রসঙ্গ : ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ

ড. মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য বুকিং দিয়েছি। প্রায় অর্ধেক টাকা ইতিমধ্যে পরিশোধ করেছি। অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের জন্য ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তথা অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ (HPSM) পদ্ধতিতে লোন প্রদান করে থাকে। এটা শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে কিভাবে নিলে শরীয়তসম্মত হবে, বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

"হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক" শরীয়তসম্মত একটি লেনদেন পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে যেকোনো ইসলামী ব্যাংকের সহিত লেনদেন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, উক্ত পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে একাধিক চুক্তি করতে হয়। উক্ত চুক্তিগুলো সম্পূর্ণ পৃথক পৃথকভাবে, যথাসময়ে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিহার্য। তাই এই পদ্ধতিতে লেনদেন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে প্রতিটি চুক্তি আলাদাভাবে হয়। অন্যথায় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (আদদুররুল মুখতার-৬/৪৭, মাআরিফুল কোরআন-১/৫২৬, ইসলাম আউর জদীদ মাআশি মাসায়েল-৫/৬৭)

গোনাহ মাফের কিছু আমল

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

একজন ব্যক্তির ঈমানের পরে প্রধান কাজ হলো, দৈনন্দিন ফরয ও ওয়াজিব আমলগুলো নিয়মিত পালন করা। অন্যদিকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অতঃপর যত পারা যায় নফল আমল করার চেষ্টা করা।

ফরয-ওয়াজিব তথা অবশ্য পালনীয় আমলের মধ্যে নিয়মিত ইবাদত তো আছেই, সেরূপ জীবনের প্রতিটি স্তরে শরীয়ত নির্ধারিত আবশ্যকীয় অনেক বিধান আছে। নামায-রোযার পাশাপাশি সেগুলোরও পরিপূর্ণ পরিপালন আবশ্যক। যেমন–সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন–সর্বক্ষেত্রে ইসলামের কিছু আবশ্যকীয় বিধান আছে। সেসব ক্ষেত্রে অবহেলার কোনো সুযোগ ইসলাম রাখেনি।

সব কিছু পালনের মধ্য দিয়েও মানুষ মানুষ হওয়ার কারণে বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি, গোনাহ ও পাপ হয়ে যায়। অনেক গোনাহ আছে, যেগুলো গোনাহ হিসেবে জানাও থাকে না। সব মিলিয়ে এমন অসংখ্য গোনাহ হয়ে যায়, যা মানুষ বোঝে না, জানে না, খেয়ালও করে না। এই কারণে আকাবীরগণ দু'আ করার সময় সবিস্তারে বলতেন–জানা গোনাহ, অজানা গোনাহ, ইচ্ছাকৃত গোনাহ, অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, কবীরা গোনাহ, সগীরা, শারীরিক অঙ্গের গোনাহ, চিন্তা-ভাবনার গোনাহ ইয়া আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিন।

কিছু গোনাহ আছে, যেগুলোর জন্য তাওবা জরুরি। আর কিছু গোনাহ আছে, যেগুলো অন্যের হকসংক্রান্ত। সেগুলোর ক্ষেত্রে তাওবাও পুরোপুরি সমাধান নয় বরং হক আদায় করতে হয় বা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। এরূপ হকসংক্রান্ত গোনাহেরও দীর্ঘ তাফসীল আছে।

ইসলামে উত্তম আমলের তালিকা যেমন দীর্ঘ, তেমনি গোনাহের তালিকাও অনেক দীর্ঘ। গোনাহের তালিকা মুসলমানদের জানা থাকাও প্রয়োজন আছে। যাতে মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। সে কারণে ইসলামী শরীয়ত এসবের তালিকাও প্রদান করেছে। দুই জাহানে করুণার আধার আকায়ে নামদার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন আমলের ফাজায়েল যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি কোন কোন আমলে সওয়াবের সঙ্গে সঙ্গে গোনাহও ক্ষমা করা হয়, তাও বলে দিয়েছেন। আমরা এবারের আয়োজনে সূত্র সহকারে এমন সব আমলের একটি তালিক দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেসব আমলের ব্যাপারে হাদীস শরীফে গোনাহ মাফ হওয়ার কথাও উল্লেখ আছে।

সুতরাং কেউ যখন উক্ত আমল এখলাস এবং সহীহ নিয়্যাতে করবে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহও ক্ষমা করে দেবেন।

মুহাদ্দীসগণের অভিমত হলো, এসব হাদীস থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সগীরাই উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'আলা চাইলে অনেক আমলের কারণে কবীরা গোনাহও ক্ষমা করে দিতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণ :

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

আপনি কি জানেন না ইসলাম গ্রহণ পূর্বেকার সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে দেয়? (মুসলিম শরীফ হা. [১২১] ১৯২)

ইচ্ছা সত্ত্বেও গোনাহে না জড়ালে :

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا

পাপ কাজের ইচ্ছাকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিই। (মুসলিম শরীফ)

উত্তম রূপে ওজু করলে :

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওজু করে তার শরীরের এমনকি নখের নিচের গোনাহ পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ)

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি আমার ওজুর মতো ওজু করে অন্তরকে কল্পনামুক্ত করে মনোযোগ সহকারে দুই রাক'আত নামায আদায় করে, তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করা হয়। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

মুআযযিন :

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ

মুআযযিনকে আযান দেওয়া কারণে সর্বোচ্চ ক্ষমা করা হয়। (আবু দাউদ শরীফ হা. ৫১৫)

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللـهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِـمُـحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এই দু'আ পাঠ করবে তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। দু'আটি হলো :

أَشْهَـدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِـاللـهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

(মুসলিম শরীফ হা. [৩৮৬] ১৩)

রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ করলে :

مَـنْ صَـلَّـى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ عَشْـرَ صَـلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলাহ তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন এবং তার ১০টি গোনাহ ক্ষমা করা হয়। (সহীহে ইবনে হিব্বান হা. ৯০৪)

নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলে :

فَـإِنَّ أَحَـدَكُـمْ إِذَا تَـوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الـمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَـطْـوَةً إِلَّا رَفَـعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً

কোনো ব্যক্তি ভালো করে ওজু করে শুধুমাত্র নামাযের নিয়্যাতে ঘর থেকে বের হলে তার প্রত্যেক কদমে একটি সওয়াব লেখা হয় এবং একটি করে গোনাহ ক্ষমা করা হয়। (বোখারী শরীফ ৪৭৭)

পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা :

حِيـنَ يَـخْـرُجُ الـرَّجُـلُ مِـنْ بَيْتِـهِ إِلَـى مَسْـجِـدِهِ، فَـرِجْلٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً

মানুষ যখন ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন তার প্রতিটি কদমে একটি করে সওয়াব লেখা হয় এবং একটি করে গোনাহ ক্ষমা করা হয়। (নাসাঈ শরীফ হা. ৭০৫)

নামায :

مَـنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ

যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওজু করে সময়মতো খুশুখুজুর সাথে নামায আদায় করে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (আবু দাউদ শরীফ হা. ৪২৫)

ـــفَـذَلِكَ مِثْـلُ الـصَّـلَوَاتِ الْخَمْـسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

...পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা এ রকম যে, আল্লাহ তা'আলা এই নামাযের মাধ্যমে গোনাহকে মিটিয়ে দেন। (বোখারী শরীফ হা. ৫২৮)

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আ আরেক জুমু'আ পর্যন্ত, রমাজান আরেক রমাজানের কৃত গোনাহের কাফফারা হয় যদি ওই লোক গোনাহে কবীরা থেকে বেঁচে থাকে। (মুসলিম শরীফ [২৩৩] ১৪)

إِنَّ الْـعَبْـدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أُتِيَ بِذُنُوبِهِ كُـلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ

যখন কোনো মুসলমান নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন সমস্ত গোনাহ কাঁধের ওপর রাখা হয়, যখন রুকু এবং সিজদা করে তখন গোনাহসমূহ ঝরে যায়। (আল হিলিয়াহ লিল আসবাহানী ৬/৯৯)

আমীন বলা :

إِذَا قَالَ الإِمَامُ :(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا :آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করবেন তখন আমীন বলো। যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। (বোখারী শরীফ হা. ৭৮২)

রাব্বানা লাকাল হামদ বলা :

إِذَا قَـالَ الإِمَـامُ سَـمِـعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا :اللَّهُـمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَـقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা বলেন তখন তোমরা আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলো। যাদের এই দু'আ ফেরেশতাদের সাথে মিলে যাবে তাদের অতীতের গোনাহ ক্ষমা করা হবে।

(বোখারী শরীফ হা. ৩২২৮)

জুমু'আ :

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, নিজের সামর্থ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে, তেল বা খোশবু ব্যবহার করে অতঃপর জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হয়, মসজিদে বসার জন্য দুজনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করে, এরপর নামায আদায় করে এবং খোতবার সময় খামুশ থাকে তাহলে তার দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। (বোখারী শরীফ হা. ৮৮৩)

নফল নামায :

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

বেশি বেশি সিজদা করো (নফল নামায পড়ো)। কারণ যখনই তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি করে গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম শরীফ হা. [৪৮৮] ২২৫)

ইশরাক বা চাশতের নামায :

مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ، كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি সূর্য উঁচু হওয়ার সময় পরিপূর্ণ ও উত্তম রূপে ওজু করে দুই রাক'আত নামায আদায় করে সে নবজাতক শিশুর ন্যায় গোনাহমুক্ত হয়ে যায়। (সুনানে দারামী, হা. ৭৪৩)

সালাতুত তাসবীহ :

সালাতুত তাসবীহের ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে–

فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ

যদি তোমার গোনাহ বালুকণার পরিমাণও হয় আল্লাহ তা'আলা তাও ক্ষমা করে দেবেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হা. ১৩৮৬)

তারাবীহ :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে মুমিন ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যাতে রমাজান মাসে রাত্রি জাগরণ করবে (তারাবীহ আদায় করবে) তার পেছনের গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (বোখারী শরীফ, হা. ৩৭)

শবেকদর :

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে মুমিন ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যাতে কদরের রাতে রাত্রি জাগরণ করবে তার পেছনের গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (বোখারী শরীফ, হা. ৩৫)

রাতের শেষভাগে ইস্তেগফার করলে :

"يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ :مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে ঘোষণা দেন যে কেউ কি আমার কাছে দু'আ করবে, আমি তার দু'আ কবুল করব। কেউ কি আমার কাছে গোনাহের ক্ষমা চাইবে, আমি তার গোনাহ ক্ষমা করব। (বোখারী শরীফ ৬৩২১)

তাসবীহ :

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ :تَمَامَ الْمِائَةِ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার سبحان الله ,৩৩ বার الحمد لله ৩৩ বার الله اكبر পড়বে, এই ৯৯ তাসবীহর সাথে

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

একবার পাঠ করে ১০০ পূর্ণ করবে তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসলিম শরীফ [৫৯৭] ১৪৬)

যিকিরের মজলিস কায়েম করা :

فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ "قَالَ " :يَقُولُونَ :مِنَ النَّارِ "قَالَ " :يَقُولُ :وَهَلْ رَأَوْهَا؟ " قَالَ " :يَقُولُونَ :لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا "قَالَ " :يَقُولُ :فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ " قَالَ " :يَقُولُونَ :لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً "قَالَ " :فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ

যিকিরের মজলিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তারা কিসের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছে, ফেরেশতাগণ বলবেন– না, দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তারা দেখত তাহলে কী করত? ফেরেশতাগণ বলেন, আরো বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৪০৮)

নেক বান্দার সুহবত গ্রহণ :

"قَالَ " :يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ : فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ .قَالَ :هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

(আল্লাহ তা'আলা যখন যিকিরের মজলিসে উপস্থিত লোকদের ক্ষমা ঘোষণা করবেন তখন) ফেরেশতারা বলবেন, হে আল্লাহ! সেখানে তো এক ব্যক্তি এমনও ছিল যে যিকির-তাসবীহ কিছুই করতে আসেনি বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যারা তাদের সাথে এসে বসেছে তারাও এই ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে না। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৪০৮)

মায়্যিতকে গোসল দেওয়া :

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

যে মায়্যিতকে গোসল দেয় এবং তার দোষত্রুটি গোপন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ১৩০৭)

১০০ ব্যক্তির জানাযা পড়া :

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِئَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، غُفِرَ لَهُ

১০০ ব্যক্তি যার জানাযা আদায় করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (ইবনে মাজাহ ১৪৮৮)

দুই বা তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করা :

لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم :يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ قَالَ : أَوِ اثْنَانِ

যদি কোনো ব্যক্তির তিনজন সন্তান মারা যায় এবং এর ওপর সে সবর করে তারা তার জন্য জাহান্নামের ঢাল হবে। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অথবা দুই? (অর্থাৎ দুইজন হলেও হবে কি না?) রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন দুই জন হলেও হবে। (মুআত্তা মালেক ২৬৬, ৮০৬)

রোযা :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (বোখারী শরীফ, হা. ৩৮)

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ

যে ব্যক্তি রমাজানের রোযা রাখবে, এর হুদুদ সম্পর্কে জানবে এবং রমাজানের পরিপূর্ণ সম্মান করবে তা তার গোনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। (মুসনাদে আহমদ, হা. ৩৪৩৩)

আরাফার দিন তথা জিলহজের ৯ তারিখ রোযা রাখা :

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ :يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

রাসূল (সা.) হতে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, এর মাধ্যমে বিগত ও আগামী এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম শরীফ হা. [১১৬২] ১৯৭)

১০ মুহাররমের রোযা :

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

রাসূল (সা.)-এর কাছে ১০ মুহাররমের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, এর মাধ্যমে অতীতের এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম শরীফ, হা. [১১৬২] ১৯৭)

সদকায়ে ফিতির :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

রোযাদারের অশ্লীল, অনর্থক কথা-কাজ (এর গোনাহের) কাফফারার জন্য এবং মিসকিনদের খাওয়ার জন্য ফিতরা ফরয করা হয়েছে। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ১৬০৯)

বৃহস্পতি ও সোমবার মাগফিরাত করা হয় :

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِكُلِّ امْرِءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার আল্লাহ তা'আলার কাছে মানুষের আমল পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরিক করে না। কিন্তু যারা নিজ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে (তাদের ক্ষমা করা হয় না) যত দিন না তারা পরস্পর সন্ধি করে। (মুসলিম শরীফ, হা. [২৫৬৫] ৩৬)

সদকা :

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ

মানুষের ঘরোয়া, সম্পদের এবং প্রতিবেশীদের ফিতনার কাফফারা নামায, রোযা, সদকা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে হয়ে যায়। (বোখারী শরীফ ৫২৫)

পিতার ইন্তেকালের পর তার জন্য সদকা করা :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ :نَعَمْ

এক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতা মারা গেছেন, তাঁর কিছু সম্পদ আছে, কিন্তু কোনো অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে কি তাঁর গোনাহ ক্ষমা করা হবে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, হ্যাঁ। (মুসলিম শরীফ [১৬৩০] ১১)

হজ :

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ করে এবং তাতে কোনো অশ্লীল ও অনর্থক কথা না বলে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি না করে তবে সে ব্যক্তি (গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে) নবজাতক সন্তানের ন্যায় প্রত্যাবর্তন করে। (বোখারী শরীফ ১৫২১)

রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়া :

হযরত ইবনে উমর (রা.) রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যভাগে দাঁড়াতেন। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا

এই রুকুন তথা হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীতে চুমু খেলে গোনাহের কাফফারা হয়। (নাসাঈ শরীফ, ৯৫৯)

বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা :

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি তাওয়াফে একটি কদম রাখে আরেকটি কদম ওঠায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং একটি সওয়াব দান করেন। (তিরমিযী শরীফ, ৯৫৯)

বালা-মুসিবত :

فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

সুতরাং মানুষের দ্বীন হিসেবেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়। যদি দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর হয় তবে তার পরীক্ষাও কঠোর হয়। যদি দ্বীনের বেলায় বিনম্র হয় দ্বীন হিসেবেই তার পরীক্ষা হয়। এমনিভাবে মানুষ পরীক্ষায় নিমজ্জিত থাকে। এই পরীক্ষা তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। (তিরমিযী শরীফ, হা. ২৩৯৮)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ

মুসলমান কোনো কষ্ট-মুসিবতে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে পড়ে। (বোখারী শরীফ, ৫৬৪৭)

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

মুসলমান কোনো কষ্ট, মুসিবত, অসুস্থতা, পেরেশানি ইত্যাদিতে পতিত হলে, তখন এমনকি কাঁটা বিদ্ধ হলে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ ক্ষমা করেন। (বোখারী শরীফ, ৫৬৪১)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

কোনো মুসলমান যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় বা এর চেয়ে বড় কষ্টে পতিত হয়, আল্লাহ তা'আলা এই কষ্টের বদলে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করেন। (মুসলিম শরীফ [২৫৭২] ৪৬)

শহীদ হওয়া :

معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তির গোনাহ হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার গোনাহ হয়ে গেছে, কিন্তু সে জানে যে, তার পালনকর্তা গোনাহ ক্ষমা করতে পারেন এবং এর ওপর শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর সে গোনাহ করে এবং ক্ষমা চায়। এরূপ তিনবার বলেন। অতঃপর বলেন, তুমি যা ইচ্ছা করো (অর্থাৎ গোনাহ করো না) তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদি তুমি তাওবা করো। (মুসলিম শরীফ, হা. [২৭৫৮] ২৯)

তাওবা করার একটি পদ্ধতি :

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ -وَقَالَ مِسْعَرٌ :ثُمَّ يُصَلِّى -فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ করার পর উত্তম রূপে ওজু করে দুই রাক'আত নামায আদায় করে এবং ইস্তেগফার করে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হা. ১৩৯৫)

এরূপ বহু আমল আছে, যেগুলো পরিপালনে আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত করেন। অসংখ্য আমল থেকে এই পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে কিছু আমলের কথা উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

فَإِذَا اسْتُشْهِدَ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقَعُ مِنْ دَمِهِ يُكَفِّرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ

যখন মুজাহিদ (যুদ্ধের মযদানে) শহীদ হয়ে যান তখন তাঁর রক্তের ফোঁটা জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (আল মুজামুল কাবীর ২২০৩)

দাড়ি-চুল পাকা হলে :

"لا تَنْتِفُوا الشَّيبَ، ما من مُسلمٍ يَشيبُ شيبةً فى الإسلامِ -قال عن سفيان -إلا كانت له نوراً يومَ القيامةِ "وقال فى حديثِ يحيى "إلا كَتَبَ اللهُ له بها حسنةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً

পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। যে মুসলমানের চুল পাকা হবে কিয়ামতের দিন এই চুল তার জন্য নূর হবে। এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা একটি পাকা চুলের বিনিময়ে একটি সওয়াব দান করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪২০২)

কোনো অপরাধের কারণে দণ্ড প্রয়োগ হওয়া :

أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَفَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ عَنْهُ

যে লোক কোনো অবৈধ কাজে জড়িত হয়েছে এবং এর কারণে তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার ওই গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (সুনানে দারা কুতনী ৩৫০৫)

মুসাফাহা করা :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ

মুমিন যখন কোনো মুমিন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সালাম করে এবং তার সাথে মুসাফাহা করে তবে তাদের উভয়ের গোনাহসমূহ গাছের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে। (আল মুজামুল আওসাত, হা. ২৪৫, শু'আবুল ঈমান, হা. ৮৫৫১)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

এক ব্যক্তি চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখল। তা সে উঠিয়ে নিল (রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল)। আল্লাহ তা'আলা তার এই কাজ পছন্দ করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৫২)

গোনাহ হয়ে যাওয়া মাত্র তাওবা করা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ " :أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ :اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ :أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ :أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ـ (اعمل ما شئت فقد غفرت لك)